আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ৫ ■ সেপ্টেম্বর ২০২৬ www.al-ummah.org

মক্কা চুক্তি

মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার পরিবর্তিত সমীকরণ

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানাঃ info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

সম্পাদকীয়

আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও মুসলিম গণমাধ্যমের যুগসন্ধিক্ষণ

'আল-উম্মাহ' সাময়িকীর এই সংখ্যাটি এমন এক সংকটময় ও তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ভূরাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা জোট নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই জোটের কাঠামোতে ন্যাটোর 'অনুচ্ছেদ ৫'-এর অনুরূপ একটি সুরক্ষা ধারার ইঙ্গিত রয়েছে–যেখানে কোনো একটি সদস্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণকে সম্পূর্ণ জোটের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে একে ন্যাটোর নিছক অনুকরণ বা অন্ধ প্রতিচ্ছবি ভাবাটা হবে সরলতা ও অপরিপক্কতার পরিচয়। বরং এর পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তাজনিত কাঠামোগত পরিবর্তন এবং নিজস্ব কৌশলগত সুরক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে পুনর্নির্ধারণের তাগিদ।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল ও সংবেদনশীল। একদিকে ইসরাইলের দীর্ঘদিনের আগ্রাসন, ধ্বংসাত্মক নীতি ও মানবিক বিপর্যয় সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে চরম হুমকির মুখে ফেলেছে; অন্যদিকে ইরানের প্রতিক্রিয়াশীল ও অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাহসী কৌশলও এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও ঘোলাটে করে তুলেছে। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে একটি আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যার নেতিবাচক প্রভাব আঞ্চলিক রাজনীতিতে স্পষ্ট।

এই দুই মেরুর মধ্যকার সংঘাতের মাঝে পড়েছে বেশ কয়েকটি আরব দেশ। এসব রাষ্ট্র ইসরাইল বা ইরান–কোনো পক্ষের সঙ্গেই সরাসরি সামরিক যুদ্ধে জড়াতে ইচ্ছুক নয়; বরং তারা দীর্ঘ দিন ধরে কূটনৈতিক উপায়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অসঙ্গতিপূর্ণ নীতি পরিস্থিতিকে আরও ঘনীভূত করেছে। একদিকে সৌদি আরবসহ ঐতিহ্যগত মিত্রদের 'নিরাপত্তা বলয়' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে ইসরাইলের প্রতি ওয়াশিংটনের অবিচল পক্ষপাত মূল আঞ্চলিক ভারসাম্যকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলের কারণে ইসরাইল-ইরান সংঘাত বারবার নির্ধারিত সীমানা ছাড়িয়ে গেছে, যার প্রভাবে সৌদি আরব, কাতার কিংবা ওমানের মতো শান্তিকামী দেশগুলোও ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারছে না। ফলে তথাকথিত 'মার্কিন নিরাপত্তা বলয়ের' কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এই কঠিন বাস্তবতাই আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে নিজেদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়নের পথ দেখিয়েছে। তাই তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যকার এই নতুন প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে স্রেফ একটি সামরিক জোট হিসেবে দেখলে এর মূল গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে না। এটি একই সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত বার্তা, নতুন নিরাপত্তার পুনর্বিন্যাস এবং ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার দূরদর্শী প্রয়াস।

'আল-উম্মাহ'-এর বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে আমরা এই তিন প্রভাবশালী মুসলিম দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পটভূমি, এর ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সাম্প্রতিক ঘটনামূল তুলে ধরা নয়, বরং এই পরিবর্তনের ভেতরের মূল সূচকগুলো পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা।

চলতি সংখ্যার আরেকটি আনন্দময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো–ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষায় একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী 'গণমাধ্যম জোট' গড়ে তোলার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি, এটি সেই অভিযাত্রায় এক বড় পদক্ষেপ।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম পরিচালনা কেবল সুন্দর কোনো কার্যালয় প্রতিষ্ঠা কিংবা একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর সঙ্গে মিশে থাকে নীতি-নৈতিকতা, খবরের মান, বস্তুনিষ্ঠতা এবং পাঠকদের আস্থার দায়বদ্ধতা। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই আমরা প্রতিদিন নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে চাই।

আমাদের প্রিয় পাঠকদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার–'আল-উম্মাহ'-এর বিশ্লেষণের গভীরতা, তথ্যের সত্যতা ও সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে উম্মাহর স্বার্থের আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা এবং তা সহজ, সাবলীল ও দায়িত্বশীল ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থাপনা করাই আমাদের মূল চালিকাশক্তি। ■

– প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

অধ্যাপক ড. এম কবির হাসান

অধ্যাপক ড. নাকিব নসরুল্লাহ

প্রধান সম্পাদক

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মাসুমুর রহমান খলিলী

সম্পাদনা সহযোগী

দ্বীন মোহাম্মাদ দুখু

ডিজাইন অ্যান্ড গ্রাফিক্স

এম. জামান

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:

info@al-ummah.org

www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة

AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)

ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ৫০ টাকা

বর্ষ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সংখ্যা ৫

মক্কা চুক্তি : মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার পরিবর্তিত সমীকরণ

পৃ. ৪

১১ ইস্তাম্বুলে আন্তর্জাতিক জেরুজালেম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন ও স্মরণসভা

১৩ ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’-এর প্রথম বড় পরীক্ষা ‘মক্কা চুক্তি’

২২ স্বর্ণ মুদ্রায় যাকে সুদ বলা হয় কাগজি মুদ্রায় তা সুদ নয়

২৫ পবিত্র কুরআনে ইবলিস : শত্রুতা, প্রলোভন এবং নৈতিক দায়িত্ব

২৮ মানবতার নিয়ন্ত্রণ : ম্যাকিয়াভেলি থেকে স্মার্ট অ্যালগরিদম

৩২ অর্থ ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনতা যেন এক অসম্পূর্ণতার নাম

৩৫ ‘আলী-বডমার পটেনশিয়াল’ থেকে বিশ্বমঞ্চে : বাঙালি পরমাণু বিজ্ঞানী শমসের আলীর অনন্য যাত্রা

৩৮ স্রেব্রেনিৎসা ট্র্যাজেডির ৩১ বছর স্মরণে লন্ডনে আলিজা ইজেতবেগোভিচের বইয়ের নতুন সংস্করণ উন্মোচন

বাংলাদেশ : রাষ্ট্র সংস্কার নাকি রাজনৈতিক সংস্কার-কোনটি আগে?

পৃ. ১৭

আল-উম্মাহ জার্নাল ও ওয়েবসাইটের ঢাকা অফিস উদ্বোধন   পৃ. ৯

৪২ ধ্বংসের মুখে সভ্যতা : বস্তুগত অগ্রগতির প্রান্তসীমায় মানবজাতি

৪৬ ভাষাগত বিকৃতি এবং সমাজ গঠনে এর প্রভাব

৪৯ কুরআন হাফেজের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু হেদায়েত অনুযায়ী আমলের চর্চা কি কমছে?

৫২ সিরিয়ার পুনর্গঠন : স্প্যানিশ আলোকচিত্রীর চোখে মানুষের জীবনসংগ্রাম

৫৭ বাংলাদেশের কওমী মাদরাসা : সার্বিক চিত্র ও উন্নয়নে করণীয়

৬০ গাজ্জার ছোট্ট ফুলেরা : শূন্যতার ভেতর রবের রহমত

৬৪ স্লিমান মনসুর : ফিলিস্তিন প্রতিরোধের তুলি ও বিস্মৃতির বিরুদ্ধে অভিভাবক

রবিউল আউয়াল : স্মৃতি, রহমত ও আত্মশুদ্ধির মাস   পৃ. ৬৯

প্রতিবেদক

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

প্রফেসর ড. শরিফুল আলম

মাসুমুর রহমান খলিলী

মো: মশিউর রহমান

আব্দুল মান্নান, পিএইচডি

মোহাম্মদ বেরো

আসরার তালুকদার, পিএইচডি

সৈয়দ ইকবাল জহীর

আসমা মুফিদ কামিল

মাওলানা লিয়াকত আলী

লেখকদের প্রকাশিত মতামত তাদের নিজস্ব। প্রকাশক এর জন্য কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না।

পাঠকেরা এই জার্নালের বিষয়বস্তু ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা পুনরায় প্রকাশ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে এর জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।

মক্কা চুক্তি | মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার পরিবর্তিত সমীকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হলো ঐতিহাসিক 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি'

এম. নাসির জাভেদ
প্রবীণ সাংবাদিক ও 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' এবং আরব নিউজ-এর সাবেক সম্পাদক, সৌদি আরব

সারসংক্ষেপ

এটি কেবল তিন দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যবর্তী সাধারণ কোনো সমঝোতা নয়; বরং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পথ, সামুদ্রিক করিডোর এবং ভূ-রাজনীতিবিদদের সংঘাতপূর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এক নতুন কৌশলগত অক্ষ।

২০২৬ সালের ৭ আগস্ট সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত 'মক্কা আল-মুকাররমা শীর্ষ সম্মেলনে' সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পাকিস্তান ঐতিহাসিক 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' স্বাক্ষর করে। ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এই ঘটনা। ধারণা করা হচ্ছে, এটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন নিরাপত্তা কাঠামোর জন্ম

তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান (বামে), সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (মাঝে), এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ খোশমেজাজে কথা বলছেন।

দেবে, মার্কিন নিরাপত্তার ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাবে, ইসরায়েল ও ইরানের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলা করবে এবং একটি 'মধ্যপ্রাচ্য ন্যাটো' (Middle East NATO)-এর ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে।

একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি বোঝা আবশ্যক, যার মূল কেন্দ্রে রয়েছে ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আগ্রাসন। পাশাপাশি ইসরায়েলের প্ররোচনায় ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, যা প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোকে সামরিক ঝুঁকিতে ফেলেছিল। মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক ব্যর্থতা থেকেই এই তিন দেশ একটি যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এটি মূলত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ত্রিদেশীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের একটি ঐতিহাসিক প্রয়াস।

তবে এ ধরনের সামরিক উদ্যোগ সম্পূর্ণ নতুন নয়; বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর রূপরেখা আগে থেকেই গড়ে উঠছিল। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি 'কৌশলগত প্রতিরক্ষা সমঝোতা' বহাল ছিল। অন্যদিকে, মিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত চারদেশীয় পরামর্শক কাঠামো (R-4) আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে—এই জোটের যেকোনো সদস্যের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পুরো জোটের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

চুক্তির বহুমুখী তাৎপর্য

এই চুক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তিন দেশের পরিপূরক সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা একে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। পাকিস্তান একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ, সৌদি আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ জ্বালানি উৎপাদক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি, আর তুরস্ক হলো ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পাওয়ার হাউস। পূর্বে মার্কিন ছায়াতলে এমন একটি জোট গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, সম্পূর্ণ আঞ্চলিক এই স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্যোগ বড় শক্তিগুলোর কৌশলগত রূপান্তরকে সামনে নিয়ে এসেছে। উপরন্তু, ইসলামের পবিত্রতম নগরী মক্কায় স্বাক্ষরিত হওয়ায় এর মনস্তাত্ত্বিক আবেদন মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে এই ত্রিভুজ আরব উপদ্বীপ, আনাতোলিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়াকে যুক্ত করেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব রয়েছে হরমুজ প্রণালী, লোহিত সাগর, পূর্ব ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর এবং ভারত মহাসাগরের মতো সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক জলসীমায়। তাই এটি শুধু সেনা

মোতায়েনের চুক্তি নয়, বরং বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের কৌশলগত অক্ষ।

চুক্তিটির সময় নির্বাচনও অত্যন্ত অর্থবহ। মধ্যপ্রাচ্য বহু বছর ধরে যুদ্ধ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, লোহিত সাগরে জাহাজে আক্রমণ, প্রক্সি সংঘাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে গেছে। দশকের পর দশক পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তা একটি সমীকরণের ওপর টিকে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক নিরাপত্তা যোগাবে, আর বিনিময়ে এই অঞ্চল বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ সচল রাখবে। তবে সাম্প্রতিক একাধিক সংকট এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও যুক্তরাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের সামরিক সক্ষমতা থাকলেও আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো এখন প্রশ্ন তুলছে–মার্কিন সহায়তা কি সত্যিই সময়মতো, শর্তহীনভাবে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে আসবে?

একই সাথে ইসরায়েলের আগ্রাসী সামরিক নীতি, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এবং লোহিত সাগরে হুথিদের অব্যাহত হামলা–দূরবর্তী কোনো পরাশক্তির ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি স্পষ্ট করেছে।

মক্কা চুক্তির ঠিক আগে সৌদি আরব লোহিত সাগরের নৌপথ সুরক্ষায় একটি বহুজাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোটের রূপরেখা ঘোষণা করে। ৪৩টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সেই আলোচনায় তুরস্ক, পাকিস্তান ও মিসরসহ ১৪টি দেশ আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানায়। এর মাধ্যমে বার্তাটি পরিষ্কার–আঞ্চলিক শক্তিগুলো আর আমদানিকৃত নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করতে চায় না, তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষার রূপকার হতে চায়।

নিরাপত্তা কাঠামো

মক্কা চুক্তির গুরুত্ব কেবল সাধারণ সামরিক সনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি পরিপূরক শক্তিসম্পন্ন তিনটি প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ছাদের নিচে এনেছে:

- **সৌদি আরব:** বিপুল অর্থায়ন ও রাজনৈতিক প্রভাব
- **তুরস্ক:** উদীয়মান অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা শিল্প ও সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী
- **পাকিস্তান:** বিশাল পদাতিক বাহিনী ও পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা

সৌদি আরব ও তুরস্কের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। 'আরব বসন্তের' পর আঞ্চলিক আধিপত্য নিয়ে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তা এখন আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তা সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। সংঘাতের চেয়ে কৌশলগত স্বার্থের যৌথ অনুধাবন যে বেশি কার্যকর–এই চুক্তি তারই প্রমাণ।

তবে প্রতীকী ভাবমূর্তির চেয়ে বড় পরীক্ষা মাঠপর্যায়ের যৌথ প্রতিরোধে। খসড়া অনুযায়ী, এতে সম্মিলিত সুরক্ষার (Collective Defense) নীতি রয়েছে; তবে আক্রমণ হলে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সামরিক হস্তক্ষেপের বদলে তা কূটনীতি,

৬ মে ২০২৬ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত সাহা আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ এক্সপোতে বায়কার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ড্রোনের ছোট আকারের প্রতিরূপ দেখছেন মানুষ।

রাজনৈতিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। ফলে এই সহায়তা গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ থেকে শুরু করে সরাসরি সৈন্য মোতায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

রাজনৈতিক ভারসাম্যের স্বার্থে এই নমনীয়তা প্রয়োজন হলেও এটি জোটের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতাকেও সামনে আনে: তিন দেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

কারণ এই তিন রাষ্ট্রের প্রধান হুমকির অগ্রাধিকার এক নয়:

১. রিয়াদ: মূল উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু ইরান ও তাদের সমর্থিত আঞ্চলিক শক্তিগুলো।
২. আঙ্কারা: প্রধান ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করে ইসরায়েলকে।
৩. ইসলামাবাদ: প্রধান নজর ভারতের দিকে, সেই সাথে ইরানের সাথে তাদের ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতে হয়।

ইতিহাস আমাদের সতর্ক করে। ১৯৫০ সালের আরব লিগের 'যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' কিংবা ২০০০ সালের জিসিসি (GCC)-র চুক্তিগুলো কাগজে-কলমে দৃষ্টিনন্দন হলেও বাস্তব সামরিক পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়েছিল। মক্কা চুক্তি কেবল তখনই সফল হবে, যখন রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সামরিক সক্ষমতায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

অতএব, চুক্তিটিতে রাজনৈতিক-সামরিক কমিটি এবং রিয়াদভিত্তিক একটি স্থায়ী সচিবালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌথ সামরিক মহড়া, সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যৌথ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড স্ট্রাকচার তৈরিই চুক্তিটিকে একটি কার্যকর আঞ্চলিক জোটে পরিণত করতে পারে।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে যৌথ সম্ভাবনা

সহযোগিতার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হলো প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও শিল্পায়ন। তুরস্ক সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং যুদ্ধবিমান তৈরিতে প্রভূত সাফল্য দেখিয়েছে। পাকিস্তানের রয়েছে দীর্ঘদিনের অস্ত্র উৎপাদন ও সামরিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। আর সৌদি আরব নিয়ে আসছে বিপুল পুঁজি এবং তাদের 'ভিশন ২০৩০'-এর অধীনে স্থানীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা। এই তিন দেশ যৌথ গবেষণা ও যৌথ অস্ত্র উৎপাদনে জোর দিলে পশ্চিমাদের সামরিক নির্ভরতা বহুলাংশে কমে আসবে।

তবে পারমাণবিক সুরক্ষার বিষয়টি কূটনৈতিক কৌশলে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তি হিসেবে পাকিস্তানের উপস্থিতি স্বভাবতই একটি প্রচ্ছন্ন পারমাণবিক প্রতিরোধের বার্তা দেয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পারমাণবিক গ্যারান্টির কথা উল্লেখ করা হয়নি, তবে এই স্ট্র্যাটেজিক অস্পষ্টতা (Strategic Ambiguity)-র একটি কৌশলগত মূল্য রয়েছে—যা

২৩ মার্চ, ২০০৭ ইসলামাবাদে পাকিস্তানের জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজের সময় উৎক্ষেপকসহ পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র 'ঘোরি'র প্রদর্শন।

শত্রুপক্ষকে যেকোনো দুঃসাহস দেখানোর আগে বাড়তি হিসাব-নিকাশ করতে বাধ্য করবে।

আঞ্চলিক হিসাব-নিকাশ ও বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া

ইসরায়েল ও ইরান–কোনো পক্ষই এই ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে নেবে না। তেহরান প্রকাশ্যে ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও পর্দার অন্তরালে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। অন্যদিকে, ইসরায়েল নিশ্চিতভাবেই তুরস্ক-পাকিস্তান-সৌদি জোটের প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবে।

ভারতও এটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। রিয়াদের সাথে নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও পাকিস্তান ও তুরস্কের সাথে তাদের দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা বলয়ে পাকিস্তানের এই কৌশলগত অংশগ্রহণ ভারতের হিসাব-নিকাশে নতুন সমীকরণ যোগ করবে। তবে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। এর অর্থ এই নয় যে এই তিন দেশ ওয়াশিংটনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছে; কারণ তিনটি দেশেরই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শক্ত অংশীদারিত্ব রয়েছে। বরং এটি নির্দেশ করে যে–অঞ্চলটি এখন একাধিক বিকল্প খোলা রাখছে (Hedging Architecture)। মার্কিন নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় আঞ্চলিক শক্তিগুলো সুরক্ষার নতুন স্তর তৈরি করছে।

উপসংহার

মক্কা চুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি আঞ্চলিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং নীতিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। বিশেষ করে এটি মার্কিন 'আব্রাহাম অ্যাকর্ড' প্রক্রিয়ার গতিকে থমকে দিয়েছে, যা মূলত ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছিল।

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো শক্তিশালী মুসলিম দেশের সাথে প্রতিরক্ষা জোটে আবদ্ধ হওয়ায় ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের বিষয়টি আপাতত অনেকটাই পিছিয়ে গেল। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, বরং মার্কিন-কেন্দ্রিক কাঠামোর বাইরে একটি শক্তিশালী বিকল্প গড়ে তুলবে।

তবে এই নতুন জোটের সামনে বড় কিছু লিটমাস টেস্ট রয়েছে:

- ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ (হুথি) কিংবা ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সাথে সৌদি আরবের নতুন করে সংঘাত বাঁধলে জোটের প্রতিক্রিয়া কী হবে?
- সুদান ও ইয়েমেনের সংকটে তাদের নীতি কতটা সমন্বিত হবে?
- আসাদ-পরবর্তী সিরিয়া এবং গাজার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনে তাদের ভূমিকা কেমন হবে?

এই আঞ্চলিক সংকটগুলোতে যৌথ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিরক্ষা-শিল্পে কার্যকর প্রয়োগই নির্ধারণ করে দেবে–'মক্কা চুক্তি' কি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসকে পুনর্লিখনের নতুন সনদ হবে, নাকি কেবল আরেকটি রাজনৈতিক দলিল হয়ে থাকবে। ■

আল-উম্মাহ জার্নাল ও ওয়েবসাইটের ঢাকা অফিস উদ্বোধন

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও গঠনমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপকে বৈশ্বিক পরিসরে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে 'আল-উম্মাহ' জার্নাল ও ওয়েবসাইটের ঢাকা অফিসের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গবেষক, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিক ও তরুণ চিন্তাবিদদের জন্য সমসাময়িক বৈশ্বিক ইস্যু, মুসলিম উম্মাহর নানাবিধ চ্যালেঞ্জ এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাধান নিয়ে আলোচনার একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ১৫ আগস্ট ২০২৬ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যালয়টির উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। নতুন লেখক গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'আল-উম্মাহর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় লেখকদের একটি প্ল্যাটফর্মে একত্র করা সম্ভব হবে।' এ উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত চেতনা আরও শাণিত হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নকীব মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ। সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর পিছিয়ে থাকা ও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি কবি রবার্ট ফ্রস্টের বিখ্যাত চরণ উদ্ধৃত করেন:

> 'গহন বনটি বড়ই সুন্দর, ছায়াময় ও গভীর;
> কিন্তু রক্ষিতে হবে যে কথা, রেখেছি যা অঙ্গীকার,
> বিশ্রামের পূর্বে চলিতে হবে বহুদূর।'

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও জার্নালের সম্পাদক মো. জাকির হোসেন বলেন, 'মুসলিম বিশ্বে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)-এর অধীনে থাকা 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সি' (আইআইএনএ)-ও বর্তমানে বন্ধ। অথচ উম্মাহর স্বার্থ ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে ওআইসির একটি শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম থাকা আবশ্যক

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আল-উম্মাহ'র প্রধান সম্পাদক এবং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এম জাকির হোসেন (বাম থেকে ২য়) এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

উম্মাহ-আল ফাউন্ডেশনের কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোনাজাত করা হয়।

ছিল।' তিনি জানান, এ শূন্যতা পূরণে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিকভাবে কাজ করবে 'আল-উম্মাহ'।

তানযিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল বলেন, 'আমাদের অভিযোগের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনকে প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর বিশ্বস্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।'

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন করডোভা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাব্বির আহমেদ, লেখক ও ব্যাংকার ড. ইকবাল কবীর মোহন এবং তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. খলিলুর রহমান মাদানী। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সালেহ আহমেদ ক্যামেরার সামনে ও পেছনে থাকা প্রতিটি গণমাধ্যমকর্মীকে সামাজিক মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। ■

ইস্তাম্বুলে আন্তর্জাতিক জেরুজালেম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন ও স্মরণসভা

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

ইস্তাম্বুল আন্তর্জাতিক আরব বইমেলার ফাঁকে গত ২৩ আগস্ট জেরুজালেম ও আল-আকসা মসজিদের স্মরণে তুরস্কে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি বিশেষ উপলক্ষ্য সামনে রেখে এই আয়োজন করা হয়–'আই অন আল-আকসা' প্রতিবেদনের ২০তম সংস্করণ প্রকাশ, তুরস্কে আন্তর্জাতিক জেরুজালেম ফাউন্ডেশনের নতুন আঞ্চলিক অফিসের উদ্বোধন এবং ১৯৬৯ সালের আল-আকসা মসজিদে সংঘটিত অগ্নিসংযোগের বার্ষিকী স্মরণ।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক জেরুজালেম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেত আগিরাকচা ঘোষণা করেন, সংস্থাটি এখন থেকে ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে তাদের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম আরও জোরদার ও বিস্তৃত করবে। বিশেষ করে জেরুজালেম-সংক্রান্ত গবেষণা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং অ্যাডভোকেসির ওপর বাড়তি জোর দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ইয়াসিন হামুদ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারসের সভাপতি আলী মুহিউদ্দিন আল-কারাদাঘী এবং প্রখ্যাত তুর্কি গবেষক ইয়াসিন আকতাই।

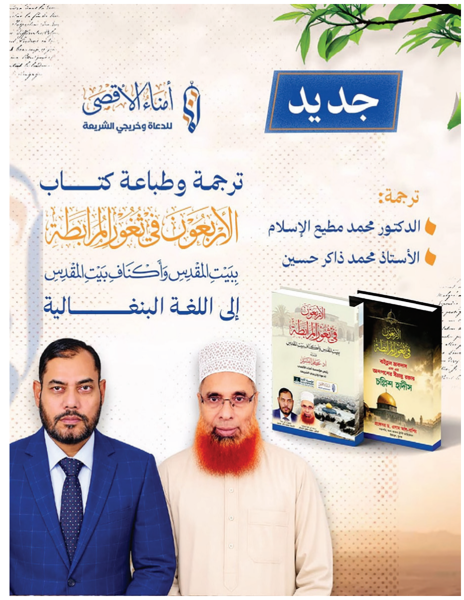

আলোচনায় বক্তারা আল-আকসা মসজিদের বর্তমান পরিস্থিতি, এর ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থা (স্ট্যাটাস কো) রক্ষায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং জেরুজালেমের ধর্মীয় ও সভ্যতামূলক তাৎপর্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আমন্ত্রিত অতিথি আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং 'আল-উম্মাহ'র প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক শেখ এসাম আল-বশিরের হাতে ফিলিস্তিনবিষয়ক একটি অনুবাদ গ্রন্থ তুলে দেন। এই উপহারের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের মাঝে ফিলিস্তিন সম্পর্কিত সাহিত্য অনুবাদ ও প্রসারের গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

ইস্তাম্বুলে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লেবাননের বাইরে আন্তর্জাতিক জেরুজালেম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্প্রসারিত হলো। এর ফলে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে।

সম্মেলনটি জেরুজালেমের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অ্যাকাডেমিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বার্তাই পুনর্ব্যক্ত করে। ■

‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’-এর প্রথম বড় পরীক্ষা ‘মক্কা চুক্তি’

মাসুমুর রহমান খলিলী
সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন একটি কৌশলগত প্রশ্ন সামনে এসেছে–সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের উদ্যোগে গঠিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে কি বাংলাদেশ যুক্ত হবে?

প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে একটি নতুন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোটে যোগদানের সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এর তাৎপর্য আরও গভীর। কারণ এটি শুধু সৌদি আরব, পাকিস্তান বা তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় নয়; এর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক, চীনের কৌশলগত হিসাব, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, বাংলাদেশের সামরিক কূটনীতি এবং সর্বোপরি বিএনপি সরকারের ঘোষিত ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ পররাষ্ট্রনীতির বাস্তব প্রয়োগ।

বিএনপি সরকারের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি 'বাংলাদেশ ফার্স্ট'

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে এর উদ্যোক্তারা একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা কাঠামো হিসেবে দেখছেন। ন্যাটোর মডেল অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো সদস্য রাষ্ট্র তৃতীয় পক্ষের সামরিক আগ্রাসনের শিকার হলে অন্য সদস্যদের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসার একটি কাঠামো তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ তাই সাধারণ কোনো কূটনৈতিক সমঝোতা হবে না। এর সঙ্গে সামরিক সক্ষমতা, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনে দেশের সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারের প্রশ্নও যুক্ত হবে।

সৌদি আমন্ত্রণ থেকে নতুন জল্পনা

মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তির আলোচনা জোরালো হওয়ার পেছনে সৌদি আরবের সঙ্গে ঢাকার সাম্প্রতিক যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি যুবরাজের পক্ষ থেকে সরকারি সফরের আমন্ত্রণ জানানোর খবরের পর থেকেই বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা বাড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চুক্তিটির প্রতি ইতিবাচক অবস্থান।

বাংলাদেশি কর্মকর্তারাও চুক্তিতে সম্ভাব্য অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনার দরজা পুরোপুরি খোলা রেখেছেন। ফলে বিষয়টি এখন নিছক কূটনৈতিক জল্পনা নয়; এটি ঢাকার নীতিনির্ধারণী আলোচনার সম্ভাব্য একটি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

তবে এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে—বাংলাদেশ কেন একটি নতুন সামরিক নিরাপত্তা কাঠামোর প্রয়োজন অনুভব করবে?

নিরাপত্তা না নতুন দায়?

যেকোনো সামরিক জোটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সামস্টিক নিরাপত্তা। এককভাবে কোনো দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ঝুঁকি থাকলে মিত্রদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা-অঙ্গীকার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর একটি কৌশলগত মূল্য থাকতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা ভারতের তুলনায় অনেক ছোট। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর, মিয়ানমার, সীমান্ত নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা সংকট এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিবেশকে ক্রমেই জটিল করছে।

কিন্তু একটি নিরাপত্তা জোটের সুবিধার বিপরীত পিঠও আছে। মিত্রের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশকে কখন, কোথায় এবং কী ধরনের সামরিক সহায়তা দিতে হবে—সেটি যদি চুক্তির বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে, তাহলে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে এমন সংঘাতেও জড়াতে হতে পারে যার সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি জাতীয় স্বার্থের সম্পর্ক নেই।

এটিই একটি সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজিক এনট্রাপমেন্ট—অর্থাৎ মিত্রের সংঘাতের কারণে নিজের অপ্রয়োজনীয় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি। এ ধরনের ঝুঁকির মধ্যেও ন্যাটো টিকে আছে। অনেক ক্ষুদ্র ইউরোপীয় দেশ ন্যাটের ছায়ায় নিরাপত্তা পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কতটা প্রস্তুত?

মক্কা চুক্তিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হলে সামরিক আন্তঃকার্যক্ষমতা একটি বড় বিষয় হয়ে উঠবে। ভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর অস্ত্রব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা, যুদ্ধকৌশল,

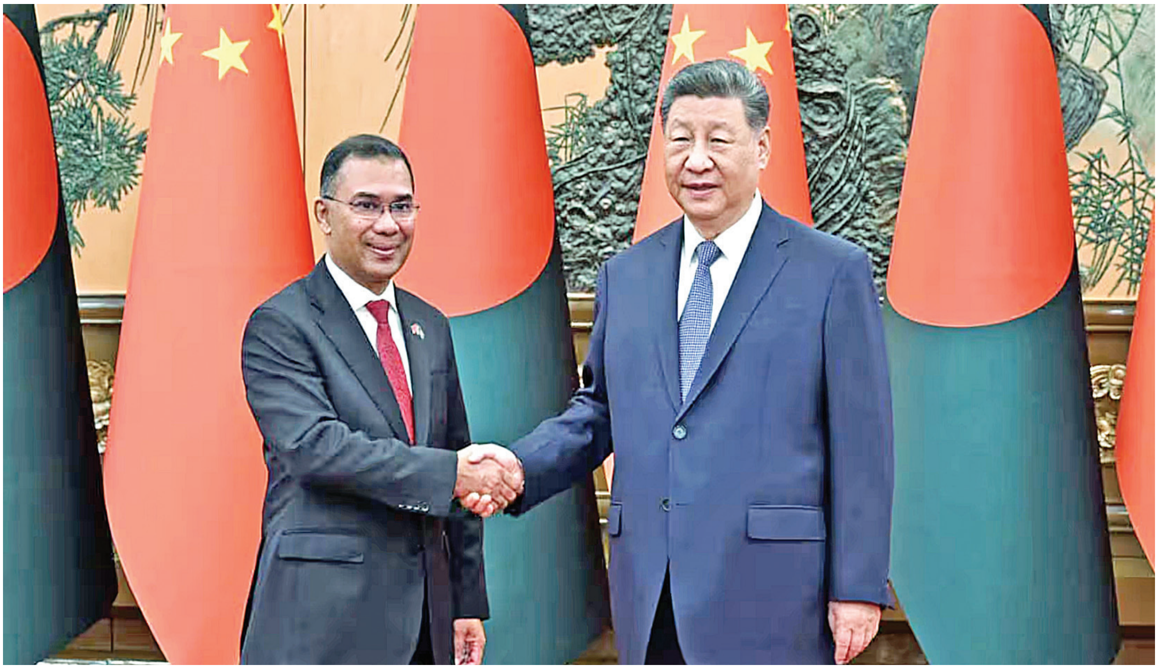

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

প্রশিক্ষণ, সামরিক মতবাদ এবং কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় ছাড়া কার্যকর যৌথ সামরিক অভিযান সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক সামরিক সহযোগিতার বাস্তব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের রয়েছে। যদিও শান্তিরক্ষা এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা এক জিনিস নয়। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সাধারণত নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ম্যান্ডেটের অধীনে কাজ করে। কুয়েতে দীর্ঘ সময় ধরে জাতিসঙ্ঘ মিশনের বাইরে সেনা বাহিনী দায়িত্ব পালন করে এসেছে।

ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বাংলাদেশের মক্কা চুক্তিতে যোগদানের সম্ভাবনায় ভারতের উদ্বেগ তৈরি হওয়ার কারণ নিয়ে নানা বক্তব্য রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক গত কয়েক বছরে নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সম্পর্ক পুনর্গঠনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বক্তব্য ও পারস্পরিক অবিশ্বাস তা আবারও জটিল করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা যদি পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে একটি যৌথ নিরাপত্তা কাঠামোয় যুক্ত হয়, দিল্লি সেটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে–তা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভারত এটিকে যদি বাংলাদেশের কৌশলগত ভারসাম্য হিসেবে দেখে, তাহলে দুই দেশের নিরাপত্তা সম্পর্ক কঠিন হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সামনে বাস্তবতা হলো এটি কোনো রাষ্ট্রবিরোধী সামরিক জোট নয় এবং বাংলাদেশের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও কৌশলগত বহুমুখীকরণ। এই বাস্তবতাকে গ্রহণ করলে উত্তেজনা সীমিত থাকবে।

সুতরাং ভারতের প্রতিক্রিয়া শুধু কূটনৈতিক নয়; এটি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তারও অংশ।

চীন কোথায়?

মক্কা চুক্তির আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি চীন। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের গভীর প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে। সৌদি আরবের সঙ্গেও বেইজিংয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ দ্রুত বেড়েছে। তুরস্কের সঙ্গেও চীনের নিজস্ব কৌশলগত হিসাব রয়েছে।

ফলে মক্কা চুক্তি যদি ভবিষ্যতে একটি কার্যকর আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোয় পরিণত হয়, চীন সেটিকে উপেক্ষা করবে না। বাংলাদেশের জন্য প্রশ্ন হলো–এই জোটে যোগ দিলে চীনের সঙ্গে তার বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে প্রভাবিত হবে? বেইজিংয়ের জন্য এটি নেতিবাচক হবার কথা নয়। ঢাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হবে কোনো একটি শক্তির নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ হয়ে অন্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না করা।

যুক্তরাষ্ট্রের সমীকরণ

মক্কা চুক্তির প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের ইতিবাচক অবস্থান বাংলাদেশের জন্য আরেকটি মাত্রা তৈরি করে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য, নিরাপত্তা, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। একই সঙ্গে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সৌদি আরব ও তুরস্কের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ।

তারেক রহমান সরকারের সামনে তাই শুধু একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রশ্ন নেই। সামনে রয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নতুন দর্শনকে বাস্তবে প্রমাণ করার প্রশ্ন। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' কি একটি রাজনৈতিক স্লোগান, নাকি সত্যিকার অর্থে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নীতি? এক্ষেত্রে মক্কা চুক্তি সই প্রশ্নের প্রথম বড় পরীক্ষা হতে পারে।

ফলে মক্কা চুক্তিকে যদি ওয়াশিংটন বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা কাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে, বাংলাদেশের অংশগ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা তৈরি করতে পারে।

'বাংলাদেশ ফার্স্ট' আসলে কী?

এখানেই মক্কা চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' যদি শুধু ভারতের ওপর নির্ভরতা কমানোর নীতি হয়, তাহলে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু যদি এর অর্থ হয়–কোনো বৃহৎ শক্তির শিবিরে না গিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা, তাহলে বিষয়টি অনেক বেশি জটিল।

কারণ সামরিক জোটে যোগদান নিজেই একটি কৌশলগত অঙ্গীকার।বাংলাদেশের জন্য তাই প্রশ্ন হওয়া উচিত না–'ভারত না পাকিস্তান?' বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত–'বাংলাদেশের জন্য কোন সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেশি কৌশলগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে?'

জোটে যাওয়ার আগে বিকল্প কী?

ঢাকার সামনে মক্কা চুক্তিতে পূর্ণ সদস্য হওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু বিকল্প থাকতে পারে। জোটের সহযোগী সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াতে পারে। সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, সামরিক শিল্প ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা যোগাযোগও সম্প্রসারিত হতে পারে।

এটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকল্প হতে পারে। এতে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে, কিন্তু বাধ্যতামূলক সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তুলনামূলক কম থাকবে। তবে সুবিধা অঙ্গীকার ছাড়া পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ অন্য দেশে বিপদে পাশে দাঁড়ালে বাংলাদেশের বিপদে অন্যরা পাশে দাঁড়াবে।

সিদ্ধান্তের আগে প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য

বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। মক্কা চুক্তিতে যোগদানের মতো সিদ্ধান্ত শুধু নির্বাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত কি না–এ প্রশ্ন উঠবেই।

বিশেষ করে যদি চুক্তিতে ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে সংসদ, বিরোধী দল, প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ একটি সরকারের মেয়াদ সীমিত হতে পারে; কিন্তু একটি সামরিক জোটের দায় কয়েক দশক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

সামনে যে চারটি প্রশ্ন

বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত চারটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে–

এক. এই জোট বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাস্তবে কতটা বাড়াবে?

দুই. জোটের বিনিময়ে বাংলাদেশকে কী সামরিক ও কূটনৈতিক দায় নিতে হবে?

তিন. ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব কী হবে?

চার. এটি কি বাংলাদেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাড়াবে, নাকি নতুন কোনো নির্ভরতার কাঠামো তৈরি করবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে শুধু 'মক্কা চুক্তি ইসলামি বিশ্বের নতুন শক্তি'–এমন সরল রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় পৌঁছানো হয়তো যাবে না। মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদান এখনই নিশ্চিত হয়ে গেছে–এমন সিদ্ধান্তে যাওয়ার কারণ নেই। কিন্তু বিষয়টি যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পরিণত হচ্ছে, তা স্পষ্ট।

তারেক রহমান সরকারের সামনে তাই শুধু একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রশ্ন নেই। সামনে রয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নতুন দর্শনকে বাস্তবে প্রমাণ করার প্রশ্ন। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' কি একটি রাজনৈতিক স্লোগান, নাকি সত্যিকার অর্থে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নীতি? এক্ষেত্রে মক্কা চুক্তি সই প্রশ্নের প্রথম বড় পরীক্ষা হতে পারে।

সিদ্ধান্তটি যদি হয়, সেটি হতে হবে আবেগ দিয়ে নয়–জাতীয় নিরাপত্তা, সামরিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্বার্থ, আঞ্চলিক ভারসাম্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বাধীনতার হিসাব মিলিয়ে। কারণ একটি সামরিক জোটে প্রবেশ করা বা না করা সহজ। কিন্তু সময়ে সিদ্ধান্ত সময়ে নিতে না পারলে বিলম্ব সুযোগের ট্রেন মিস করার কারণও হতে পারে। ■

যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

রাষ্ট্র সংস্কার নাকি রাজনৈতিক সংস্কার-কোনটি আগে?

প্রফেসর ড. শরিফুল আলম
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার ও প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর পলিসি এ্যানালাইসিস এ্যান্ড এ্যাডভোকেসি।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে; ততই একটি মৌলিক প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে; আর তা হলো-রাষ্ট্রকে সংস্কার করবে কে?

সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্থানীয় সরকার কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের নানা প্রস্তাব আলোচনায় আছে। কিন্তু যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবে, সেই দলটি নিজেই যদি দুর্বলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত, ব্যক্তিনির্ভর, অস্বচ্ছ ও জবাবদিহিহীন হয়, তাহলে রাষ্ট্র সংস্কার কতটা স্থায়ী হবে বা সংস্কার কতখানি আশা করা সম্ভব?

এই প্রশ্নকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য রাজনৈতিক

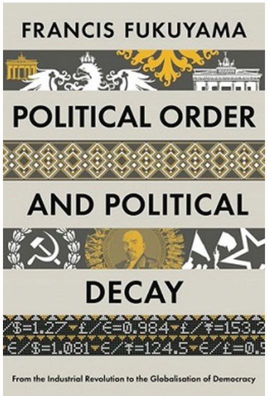

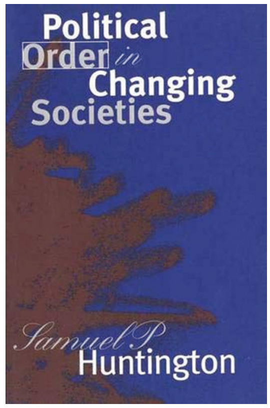

উন্নয়ন বিষয়ক দু'জন প্রতিষ্ঠিত চিন্তাবিদ–স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন এবং ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার ধারণা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন তাঁর গ্রন্থ Political Order in Changing Societies (1968)-এ যুক্তি দেন যে, আধুনিকায়নের সাথে সাথে সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়লেও যদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে রাজনৈতিক দল যদি সেই অংশগ্রহণকে ধারণ করতে না পারে, তাহলে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব দেখা দেয় এবং তা থেকে রাজনৈতিক ক্ষয় (political decay) ঘটে। তিনি বলেন, শক্তিশালী দল ছাড়া কোন আধুনিক রাষ্ট্র স্থায়ী রাজনৈতিক শৃঙখলা অর্জন করতে পারে না। দুর্বল দলভিত্তিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র 'প্রেটোরিয়াল' হয়ে ওঠে; যেখানে সেনা, আমলা বা ব্যক্তিগত নেতৃত্বের খেলায় পরিণত হয়। তাই হান্টিংটনের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো, নিয়ম, নেতৃত্বের স্থানান্তর ও সামাজিক শিকড় রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। ক্ষমতাসীন দল যদি ক্লায়েন্টালিস্ট, ব্যক্তিগত ও গণতন্ত্রবিরোধী হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন) সহজেই দলীয়করণের শিকার হয়। তাই দলের সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যুক্তি এখান থেকেই আসে। অন্যদিকে, ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তাঁর Political Order and Political Decay (2014) গ্রন্থে হান্টিংটনের ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করেন এবং দেখান যে উন্নত গণতন্ত্রেও প্রতিষ্ঠানের ক্ষয় হতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, শক্তিশালী রাষ্ট্র, আইনের শাসন ও জবাবদিহিমূলক সরকার–এই তিনটি উপাদানের ভারসাম্য ছাড়া টেকসই রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। রাজনৈতিক দলের সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। ক্ষমতাসীন দলের সংস্কার আগে করলে তা 'স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ'-এর মতো ঘটনা ঘটে–যা বিরল। ইতিহাসে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যিক চাপ (আন্দোলন, সংকট, আন্তর্জাতিক চাপ বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা) দলকে সংস্কারে বাধ্য করে। হান্টিংটন নিজেই বলেছেন, সংস্কার সবচেয়ে সফল হয় যখন তা ধাপে ধাপে হয়, নাটকীয়ভাবে একসঙ্গে নয়।

হান্টিংটন এবং ফুকুইয়ামার চিন্তাধারাকে একসঙ্গে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। আর তা হলো–রাষ্ট্র সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কারকে আলাদা করে দেখলে কোনো সংস্কারই দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের পর ফ্যাসিবাদ পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই যুগ-সন্ধিক্ষণে তাত্ত্বিকতার আলোকে নিচে এসব বিষয় নিয়েই খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে।

হান্টিংটন : রাজনৈতিক দল দুর্বল হলে রাষ্ট্রও দুর্বল হয়

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের রাজনৈতিক উন্নয়নবিষয়ক মূল যুক্তি ছিল অত্যন্ত সরল কিন্তু গভীর। আধুনিকায়ন, শিক্ষা, নগরায়ণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়তে পারে। কিন্তু সেই বাড়তি অংশগ্রহণকে ধারণ করার মতো শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকলে উন্নয়নের পরিবর্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। হান্টিংটনের ভাষায়, রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল প্রশ্ন শুধু সরকার গণতান্ত্রিক কি না, তা নয়; বরং রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতটা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত।

তাঁর মতে, একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী হতে হলে তার মধ্যে অভিযোজনক্ষমতা, জটিলতা, স্বায়ত্তশাসন এবং সংহতি থাকতে হয়। এই মানদণ্ড রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ একটি দল যদি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার বা সীমিত ক্ষমতাকেন্দ্রের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়, নিয়মিত নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রক্রিয়া না থাকে, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অস্বচ্ছ হয় এবং দলীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়ে–তাহলে সেই দলকে প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত বলা কঠিন।

হান্টিংটনের রাজনৈতিক ক্ষয় তত্ত্ব এখানেই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিস্তার যদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার চেয়ে দ্রুত হয়, তাহলে রাজনৈতিক ক্ষয়, অস্থিতিশীলতা এবং প্রেটোরিয়ান ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এখানে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দল হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী সেতু। এই সেতু দুর্বল হলে জনগণের দাবি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ দুর্বল হয়ে যায়। ফলে রাজনীতি নীতিনির্ভর প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হান্টিংটনের শিক্ষা হলো–শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়তে হলে শক্তিশালী, নিয়মভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল প্রয়োজন।

কিন্তু শক্তিশালী দল মানেই কি গণতান্ত্রিক দল?

এখানেই হান্টিংটনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব সময় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হবে–এমন নিশ্চয়তা নেই। একটি রাজনৈতিক দল অত্যন্ত সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কার্যকর হতে পারে; কিন্তু একই সঙ্গে সেটি রাজনৈতিক

বাংলাদেশের জন্য সংস্কারের প্রকৃত পথটি সম্ভবত এমন–শুধু রাষ্ট্র সংস্কার নয়। শুধু দলীয় সংস্কারও নয়। বরং রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহির মধ্যে আনা এবং রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় দখল থেকে রক্ষা করা।

প্রতিযোগিতা সীমিত করতে পারে, ভিন্নমতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পারে। সুতরাং শুধু রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হলো–সেই সক্ষমতা কার নিয়ন্ত্রণে এবং কী ধরনের নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে? এখানেই ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

ফুকুইয়ামা : শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রয়োজন আইনের শাসন ও জবাবদিহি

ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় তিনটি মৌলিক স্তম্ভকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন– **এক.** রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা, **দুই.** আইনের শাসন এবং **তিন.** জবাবদিহিমূলক সরকার। এই তিনটির ভারসাম্য নষ্ট হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটতে পারে। রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু আইনের শাসন দুর্বল হলে ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। আবার জবাবদিহি থাকলেও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সক্ষমতা দুর্বল হলে সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। অর্থাৎ ফুকুইয়ামার দৃষ্টিতে একটি উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুধু 'শক্তিশালী সরকার' নয়; বরং সক্ষম রাষ্ট্র, আইনের শাসন ও জবাবদিহি–এই তিনটির সমন্বয়।

সেজন্য ফুকুইয়ামা রাজনৈতিক ক্ষয়ের ধারণাকেও নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একবার গড়ে উঠলেই তা চিরস্থায়ীভাবে কার্যকর থাকবে–এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উন্নত গণতন্ত্রেও প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী, প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠিত এলিটদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। এই অবস্থাকে তিনি রাজনৈতিক ক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলাদেশের জন্য এর গুরুত্ব ও শিক্ষা : পঞ্চস্তম্ভ বিশিষ্ট সংস্কার কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

আমরা প্রায়ই মনে করি, নতুন আইন তৈরি করলেই প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে। কিন্তু আইন প্রণয়নের পর সেই আইন কে বাস্তবায়ন করবে? প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কে নির্বাচন করবে? নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কার প্রভাব থাকবে? যদি রাজনৈতিক দল ও ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের আচরণ অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে নতুন প্রতিষ্ঠানও পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধীনে চলে যেতে পারে। এটাই রাজনৈতিক সংস্কার ও রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

হান্টিংটন আমাদের সতর্ক করেন দুর্বল রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কে। আর ফুকুইয়ামা আমাদের সতর্ক করেন প্রতিষ্ঠানের দখল ও রাজনৈতিক ক্ষয় সম্পর্কে। হান্টিংটনের প্রশ্ন হলো : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কি যথেষ্ট শক্তিশালী? ফুকুইয়ামার প্রশ্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে–শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কি আইনের শাসন ও

বাংলাদেশের সামনে এখন শুধু রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্ন নয়; এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনর্গঠনের প্রশ্ন। আমাদের শুধু প্রশ্ন করা উচিত নয়–'কে ক্ষমতায় যাবে?' প্রশ্ন হওয়া উচিত–দলটি কি নিজের ভেতরে গণতান্ত্রিক? তার অর্থের উৎস কি স্বচ্ছ? তার নেতৃত্ব কি জবাবদিহির আওতায়? দলটি কি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়? ক্ষমতায় গিয়ে সে কি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করবে, নাকি নিজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনবে?

জনজবাবদিহির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে? এই দুই প্রশ্নকে একত্র করলে বাংলাদেশের জন্য একটি পঞ্চস্তম্ভের সংস্কার কাঠামো দাঁড়ায়– প্রথমত, শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল। দ্বিতীয়ত, সক্ষম ও পেশাদার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। তৃতীয়ত, আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন। চতুর্থত, কার্যকর জনজবাবদিহি ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। এবং পঞ্চমত: রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটি ও অর্থায়ন (political integrity and financing)।

শুধু প্রথমটি থাকলে সংগঠিত কিন্তু কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। শুধু দ্বিতীয়টি থাকলে একটি শক্তিশালী কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হতে পারে। শুধু জবাবদিহির দাবি থাকলেও যদি রাষ্ট্রের সক্ষমতা দুর্বল হয়, তাহলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হবে না। আর এসবের পূর্ণতাও পাবে না; যদি না রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটি ও অর্থায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে দলের এবং দলীয় ব্যক্তির দুর্নীতিমুক্ত থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ই টেকসই রাজনৈতিক উন্নয়নের পথ। তবে কলামের সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে শুধু রাজনৈতিক অর্থায়ন ও ইনটিগ্রিটির বিষয়টি একটু ধারণা দেয়া হলো।

কেন রাজনৈতিক অর্থায়ন সংস্কারের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন?

রাজনৈতিক সংস্কারের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত একটি বিষয় হলো রাজনৈতিক অর্থায়ন। রাজনৈতিক দল কোথা থেকে অর্থ পায়, বড় অনুদানের উৎস কী, দলীয় অর্থ কীভাবে ব্যয় হয় এবং সেই অর্থের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নীতি বা ব্যবসায়িক স্বার্থের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না–এসব প্রশ্ন গণতান্ত্রিক জবাবদিহির অংশ।

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা দেখায় যে রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক অর্থায়ন, দলীয় হিসাব, নেতাদের সম্পদ এবং

সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত নিয়ে আরও শক্তিশালী ও যাচাইযোগ্য স্বচ্ছতার কাঠামো প্রয়োজন। যাতে জনগণের কাছে সব রাজনৈতিক দল এবং দলীয় নেতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকে। এখানে লক্ষ্য কাউকে প্রমাণ ছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত বলা নয়। বরং এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে তথ্য গোপন করার প্রয়োজন হবে না এবং জনগণ নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করতে পারবে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটিও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কেন রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটি? সংক্ষেপে তা নিচে তুলে ধরা হলো।

'Integrity Before Power' : নতুন রাজনৈতিক নীতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, আর তা হলো–Integrity Before Power। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়ার আগে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকে ন্যূনতম কিছু মানদণ্ডে নিজেদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। যেমন–রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের স্বাধীন নিরীক্ষা; বড় অনুদানের উৎস প্রকাশ; রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঘোষিত সম্পদ ও স্বার্থের সংঘাতের তথ্য; দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া; প্রার্থী মনোনয়নে নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি; দলীয় অর্থ ও ব্যক্তিগত অর্থের সুস্পষ্ট বিভাজন ইত্যাদি।

এই ধারণাটি কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়; বরং ক্ষমতায় যাওয়ার আগে রাজনৈতিক সততার একটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরীক্ষা। এ ধারণাকে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে নাগরিকরা শুধু 'কে ক্ষমতায় যাবে' এই প্রশ্ন করবেন না; বরং প্রশ্ন করবেন–'কে কতটা স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নৈতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য?'

বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সংস্কার সূত্র

হান্টিংটন ও ফুকুইয়ামার রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নের ব্যাখার আলোকে বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবসম্মত সংস্কার সূত্র হতে পারে। আর তা হলো– রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ (Political Institutionalization), রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা (State Capacity), আইনের শাসন (Rule of Law), গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা (Democratic Accountability) ও রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটি ও অর্থায়ন (political integrity and financing)। তবে এটি সরল রৈখিক প্রক্রিয়া নয়। রাজনৈতিক দল শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক হবে; রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সক্ষম হবে; আইন সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর হবে; ক্ষমতাসীন দলসহ সব রাজনৈতিক শক্তি জনগণের কাছে জবাবদিহির মধ্যে থাকবে এবং রাজনৈতিক ইনটিগ্রিটি ও অর্থায়নও স্বচ্ছ হতে হবে। এই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে চললে এর সুফল পাওয়া যাবে না। কারণ হান্টিংটন ছাড়া আমরা বুঝতে পারব না কেন দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে। আর ফুকুইয়ামা ছাড়া আমরা বুঝতে পারব না কেন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও জবাবদিহি ও আইনের শাসন ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষয়ের শিকার হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সংস্কার আগে, না ক্ষমতাসীন দলের সংস্কার আগে?

এখন মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। তত্ত্বগতভাবে বলা সহজ–ক্ষমতাসীন দলের সংস্কার আগে হওয়া উচিত। কারণ দলই সরকার গঠন করে, আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে প্রশ্ন হলো–ক্ষমতাসীন দল কি স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষমতা সীমিত করবে? দলের অর্থায়ন প্রকাশ করবে? অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে প্রকৃত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে? নেতৃত্বের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করবে? প্রার্থী মনোনয়নে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে? রাজনৈতিক বাস্তবতা বলে, সব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-সংস্কারের ওপর নির্ভর করা যায় না। এ কারণেই রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজন। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, স্বাধীন নিরীক্ষা এবং কার্যকর জবাবদিহির কাঠামো রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ পরিবর্তনে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু অন্যদিকে, শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই হবে না। রাজনৈতিক দল অপরিবর্তিত থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আবারও দলীয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। এই দ্বৈত বাস্তবতাও আমরা দেখেছি। সুতরাং সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উত্তর হলো–রাষ্ট্র সংস্কার রাজনৈতিক সংস্কারের বিকল্প নয়; রাষ্ট্র সংস্কারকে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিক চালিকাশক্তি হতে হবে।

শেষ কথা

বাংলাদেশের সামনে এখন শুধু রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্ন নয়; এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনর্গঠনের প্রশ্ন। আমাদের শুধু প্রশ্ন করা উচিত নয়–'কে ক্ষমতায় যাবে?' প্রশ্ন হওয়া উচিত–দলটি কি নিজের ভেতরে গণতান্ত্রিক? তার অর্থের উৎস কি স্বচ্ছ? তার নেতৃত্ব কি জবাবদিহির আওতায়? দলটি কি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়? ক্ষমতায় গিয়ে সে কি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করবে, নাকি নিজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনবে?

তাই বাংলাদেশের জন্য সংস্কারের প্রকৃত পথটি সম্ভবত এমন–শুধু রাষ্ট্র সংস্কার নয়। শুধু দলীয় সংস্কারও নয়। বরং রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহির মধ্যে আনা এবং রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় দখল থেকে রক্ষা করা। এটাই হতে পারে চব্বিশের জুলাই বিপ্লব পরবর্তী ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশের টেকসই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কারের নতুন দর্শন। আর সেই দর্শনের মূলনীতি হওয়া উচিত–ক্ষমতার আগে সততা, দলের আগে প্রতিষ্ঠান, আর রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংস্কার। ■

স্বর্ণ মুদ্রায় যাকে সুদ বলা হয় কাগজি মুদ্রায় তা সুদ নয়

মো: মশিউর রহমান
ব্যবসা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
mashiur.du@gmail.com

মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাস শুরু হয় বিনিময় প্রথা (পণ্য দিয়ে পণ্য কেনা-বেচা) থেকে, যা পরে সোনা-রূপার মতো মূল্যবান ধাতুর নির্দিষ্ট ওজনের খণ্ডে রূপান্তরিত হয় (যেমন: লিডিয়ান সিংহ মুদ্রা), এরপর আসে রাজকীয় প্রতীকযুক্ত ধাতু মুদ্রা, যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতো, এবং সবশেষে আধুনিক কাগজী মুদ্রা ও ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতির উদ্ভব হয়, যা অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে 'টাকা' বাংলাদেশের সরকারি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে রিবা (সুদ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫।

রিবা আরবি শব্দে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ যার অর্থ কেউ বলেছেন সুদ (অর্থাৎ ধারের বিনিময় অতিরিক্ত) আবার কেউ বলেছেন রিবা অর্থ অর্থনৈতিক অবিচার অর্থাৎ সব ধরনের অর্থনৈতিক অন্যায়, যেমন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি না দেয়া কিংবা শেয়ারবাজারে ছলচাতুরী করে অন্যের অর্থ হাতিয়ে নেয়াও অর্থনৈতিক অবিচার।

আমরা ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, রৌপ্য দিরহাম (পারস্য/সাসানীয় সাম্রাজ্যের মুদ্রা) এবং স্বর্ণ দিনার (রোমান/বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মুদ্রা) মুদ্রা চালু ছিল এবং পরবর্তীতে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৯৫-৬৯৭ খ্রি.) প্রথম সম্পূর্ণ ইসলামী স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম চালু করেন। এতে মানুষের ছবি বাদ দিয়ে আরবি লেখা, কুরআনের আয়াত ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকত ।

উল্লেখ্য, স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহামের বিশেষ কিছু বিশিষ্ট ছিল যা পরবর্তীতে চালু হওয়া কাগজি মুদ্রার ক্ষেত্রে নাই, যেমন: ১. স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহামের নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) থাকে, অর্থাৎ মুদ্রাটি নিজেই মূল্যবান–স্বর্ণ বা রুপা দিয়ে তৈরি। ২. স্বর্ণ মুদ্রার দুটো value আছে value in use and value in exchange, ৩. সরকার স্বর্ণ মুদ্রা বাতিল করে দিলেও মূল্য হারাবে না।

অন্যদিকে কাগজি মুদ্রার (Fiat Money) বৈশিষ্ট্য হলো: ১. কাগজি মুদ্রার নিজের কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। ২. সরকারের 'বিশ্বাসযোগ্যতা' ও 'আইনি ক্ষমতা' (legal tender) দিয়েই এর মূল্য টিকে থাকে। অর্থাৎ সরকার বলে যে, 'এই কাগজের টুকরো দিয়ে জিনিস কেনাবেচা হবে'–এই বিশ্বাসেই এটি কাজ করে। ৩. কাগজি মুদ্রা

আসলে প্রতিনিধি মুদ্রা (representative money) – মূল মুদ্রার বিকল্প, তবে আসল স্বর্ণ-রুপার সমান নয়। ৪. কাগজি মুদ্রা সরকার বাতিল করে দিলে বড়জোর আগুন জ্বালাতে ব্যবহার করা যাবে।

এখন জানার বিষয় টাকা ও ডলার কিসের বিপরীতে ছাপানো হয়? ১. আগে (১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত) ডলার ও টাকার পেছনে স্বর্ণের রিজার্ভ থাকত। এটা বলা হতো Gold Standard System, অর্থাৎ ১ ডলার মানে ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ। ২. ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডলারকে স্বর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ৩. এখনকার টাকা বা ডলার কোনো স্বর্ণের বিপরীতে নয়, বরং সরকারের বিশ্বাস ও ঋণ (creditworthiness) এর বিপরীতে ছাপানো হয়। এখন এটি Fiat Money System – অর্থাৎ 'সরকারে আদেশে সৃষ্ট'।

অন্যদিকে করোনার সময় মুদ্রা ছাপানোর ক্ষেত্রে যে নিয়ম মানা হয় তা হলো, ১. ২০২০ সালে কোভিড মহামারির সময় বিশ্বজুড়ে (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে) সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বিপুল পরিমাণ নতুন মুদ্রা ছেপেছিল – Quantitative Easing (QE) নামে। ২. কোনো স্বর্ণ বা বাস্তব সম্পদের বিপরীতে নয়, বরং ডিজিটালভাবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে নতুন অর্থ যোগ করা হয়েছিল। ৩. এতে অর্থনীতিতে কিছুটা স্বস্তি এলেও পরবর্তীতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়। অর্থাৎ করোনার সময়কার টাকা ছিল পুরোপুরি 'কৃত্রিম সৃষ্ট অর্থ' (fiat money creation)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা কোনো অবস্থাতেই কাগজি মুদ্রার সমান নয়। স্বর্ণ মুদ্রার যেহেতু ব্যবহারিক মূল্য আছে তাই ইহা বর্তমানে মুদ্রা না হয়েও বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে স্বর্ণের দাম প্রতিবছর বাড়ছে আর কাগজি মুদ্রার দাম প্রতিবছর কমছে যদি স্বর্ণের সাথে তুলনা করি বা অন্য কোনো পণ্যের সাথে। অর্থাৎ স্বর্ণের দামের সাথে কাগজি মুদ্রার দামের সাথে বিপরীতমুখি সম্পর্ক, স্বর্ণের দাম বাড়লে কাগজি মুদ্রার দাম কমে। দেখা যাক বাস্তবে কি হয়,

উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট বলা যায় স্বর্ণের পরিমাণের বৃদ্ধিই অতিরিক্ত বা সুদ তবে টাকার সাধারণ অতিরিক্ত সুদ নয় তবে স্বর্ণের দামের যা বৃদ্ধি হয় তার চেয়ে বেশি দিলে এখানে যতটুকু বেশি দেয়া হবে তাই হলো সুদ। অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রায় যাকে সুদ বলা হয় কাগজি মুদ্রায় তা সুদ নয়। এই সত্য না জানলে আপনি সুদ না নিয়েও সুদের যন্ত্রণায় থাকবেন। ■

পবিত্র কুরআনে ইবলিস:
শত্রুতা, প্রলোভন এবং নৈতিক দায়িত্ব

ড. আব্দুল মান্নান
ইমাম ও সভাপতি, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্দার্ন ফিনল্যান্ড, ওউলু

সারসংক্ষেপ :

পবিত্র কুরআন শয়তান বা ইবলিসকে মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করেছে; তবে আল্লাহর দৈব সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের নৈতিক দায়িত্বের কাঠামোর মধ্যেই তার ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই নিবন্ধটি ইবলিসের বিদ্রোহ, পরিচয়, বিভ্রান্তি ছড়ানোর পদ্ধতি এবং তার ক্ষমতার সীমার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শয়তানের কুরআনিক চিত্রায়ণকে পর্যালোচনা করে। নিবন্ধটির উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়েছে যে, কুরআন শয়তানকে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মন্দের কোনো স্বাধীন শক্তি হিসেবে চিত্রিত করে না; বরং সে একটি নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল সৃষ্টি, যার প্রভাব কেবল মানুষের

নিজস্ব পছন্দ এবং আল্লাহর অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের জবাবদিহিতা–উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে কুরআন মন্দকে দুই বিরোধী শক্তির মহাজাগতিক দ্বৈতবাদের পরিবর্তে একটি নৈতিক পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে স্থান দিয়েছে।

মূলশব্দ: শয়তান (ইবলিস), কুরআনিক ধর্মতত্ত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will), নৈতিক দায়িত্ব, প্রলোভন, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব (কালাম)।

ভূমিকা

কুরআনিক পাঠে শয়তান একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, বিশেষ করে আনুগত্য, বিদ্রোহ এবং নৈতিক জবাবদিহিতা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে। কুরআন ধারাবাহিকভাবে তাকে মানবতার জন্য এক স্পষ্ট শত্রু হিসেবে বর্ণনা করে; একই সঙ্গে এটিও নিশ্চিত করে যে তার ক্ষমতা সীমিত এবং তা পরম ঐশ্বরিক ইচ্ছার অধীন। এই চিত্রায়ণ জগতের নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি বিরোধী শক্তির লড়াই সম্বলিত 'শুভ ও অশুভের' দ্বৈতবাদী ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এর পরিবর্তে, কুরআন শয়তানকে এমন এক সৃষ্ট সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে, যার কর্মকাণ্ড মানবজীবনের ঐশ্বরিক পরীক্ষারই একটি অংশ।

কুরআনের বস্তুনিষ্ঠ পাঠ প্রকাশ করে যে, শয়তানের তাৎপর্য তার নিজস্ব কোনো স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মধ্যে নয়; বরং প্রলোভন সৃষ্টি ও মানবজাতিকে প্ররোচিত করার ভূমিকার মধ্যেই নিহিত। তার বিদ্রোহ, প্রতারণার পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতা মূলত মানবজাতির স্বাধীন ইচ্ছা, জবাবদিহিতা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা সম্পর্কিত মূল ধর্মতাত্ত্বিক দর্শনকে ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং, কুরআনিক পাঠে শয়তানকে অহংকার ও অবাধ্যতার বিষময় পরিণতি তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা পাশাপাশি আল্লাহর পরম সার্বভৌমত্বকেই পুনর্ব্যক্ত করে।

ইবলিসের অবাধ্যতা

মানবজাতির প্রতি শয়তানের শত্রুতার মূল নিহিত রয়েছে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কাহিনীর মধ্যে। কুরআন উল্লেখ করেছে যে, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের আদমের সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ইবলিস ব্যতিরেকে তারা সবাই সিজদা করেছিল (সূরা আল-আ'রাফ: ১১-১২)। তার এই অস্বীকৃতির পেছনে ছিল চরম অহংকার; কারণ সে নিজেকে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তার যুক্তি ছিল–তাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

এই ঘটনাটির গুরুত্ব এই জায়গায় যে, এটি শয়তানের পতনকে কোনো জ্ঞানের ঘাটতি হিসেবে না দেখিয়ে একটি নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে চিত্রিত করে। ইবলিস আল্লাহর পরম কর্তৃত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল, তবুও সে জেনেশুনে অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছিল। তার বিদ্রোহ ছিল অহংকারের এক বহিঃপ্রকাশ, আর এই আত্মম্ভরিতাই হয়ে ওঠে তার পতনের মূল কারণ। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পর, সে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আয়ু বা অবকাশ প্রার্থনা করে এবং মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় (সূরা আল-আ'রাফ: ১৪-১৭)। সুতরাং, মানুষের প্রতি তার এই শত্রুতা কোনো সহজাত ত্রুটি থেকে নয়; বরং বিদ্বেষ ও অহংকার থেকে উদ্ভূত।

এই বিবরণটি একটি মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করে: অবাধ্যতার মূল সারবস্তু হলো নৈতিক অবক্ষয় ও অহংকার। শয়তান আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক জ্বলন্ত প্রতীকে পরিণত হয়; অন্যদিকে আদমের ঘটনাটি তওবা করা এবং আল্লাহর ক্ষমা লাভ করার চিরন্তন সম্ভাবনার দিকটি নির্দেশ করে।

ইবলিসের পরিচয় ও অস্তিত্বগত মর্যাদা (Ontological Status)

কুরআন স্পষ্টভাবে ইবলিসকে জিনদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে (সূরা আল-কাহফ: ৫০)। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীন ইচ্ছা বা পাপ করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু জিনদের মানুষের মতোই ভালো বা মন্দের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে, শয়তানের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ ছিল জেনেশুনে বেছে নেওয়া এক অপরাধ, যা কোনো ফেরেশতার পক্ষে সম্ভব নয়। নৈতিক ভুলত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য–জিন হিসেবে ইবলিসের প্রকৃতি ঠিক তেমনই ছিল।

কুরআনের বহু আয়াতে শয়তানকে মানবজাতির জন্য 'স্পষ্ট শত্রু' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (সূরা আল-বাকারা: ৩৬; সূরা ইয়াসিন: ৬০)। এই বর্ণনাটি তার শত্রুতার স্পষ্টতাকে জোর দেয় এবং মুমিনদের অসচেতনতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। 'শয়তান' শব্দটি নিজেই বিদ্রোহ এবং ঐশ্বরিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিছু প্রেক্ষাপটে, এই শব্দটি কেবল জিনদের জন্যই নয়, বরং সেইসব মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় যারা সক্রিয়ভাবে মন্দ ও অনাচার ছড়ায়। এটি ইঙ্গিত করে যে শয়তানি আচরণ মানুষের কর্মের মাধ্যমেও রূপ লাভ করতে পারে।

এই চিত্রায়ণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে–যেখানে মন্দকে কোনো স্বাধীন মহাজাগতিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করা হয়নি; বরং মন্দ মূর্ত হয়ে ওঠে সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কর্মের মাধ্যমে, যা ঐশ্বরিক নির্দেশনার বিরোধিতা করে।

প্রতারণা এবং প্রলোভনের পদ্ধতি

প্রতারণা হলো কুরআনে শয়তানের কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবজাতির ওপর তার প্রভাব বলপ্রয়োগ বা বাধ্যতামূলক নয়, বরং প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা (ওয়াসওয়াসা) এবং মিথ্যাকে আকর্ষণীয় রূপ দেওয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। কুরআন প্রায়শই শয়তানকে মন্দ কাজগুলোকে 'মনোমুগ্ধকর' হিসেবে উপস্থাপন করার কারিগর হিসেবে চিত্রিত করে, যা মানুষকে ঐশ্বরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করতে প্রলুব্ধ করে (সূরা আল-আ'রাফ: ২০; সূরা আন-নহল: ৬৩)।

আদম ও তাঁর স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করার ঘটনাটি এর আদি ও মূল উদাহরণ। শয়তান অমরত্ব ও উচ্চ মর্যাদা লাভের

লোভ দেখিয়ে তাদের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছিল। শয়তান তাদের পাপ করতে বাধ্য করেনি; বরং সে মানুষের মানসিক দুর্বলতা ও সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়েছিল। কুরআনে যেখানেই প্রলোভনের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে এই ঘটনাটিকেই একটি সার্বজনীন রূপরেখা হিসেবে গণ্য করা যায়।

কুরআন আরও উল্লেখ করে যে, মদ্যপান, জুয়া এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির মতো সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ ক্ষুণ্নকারী বিষয়গুলোর নেপথ্যে শয়তানের প্ররোচনা কাজ করে (সূরা আল-মায়িদা: ৯০-৯১)। ইসলামী শরিয়তে এই কাজগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কারণ এগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং নৈতিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

তা সত্ত্বেও, কুরআন জোর দিয়ে বলে যে শয়তানের প্রলোভন মানুষকে তার নিজস্ব দায়ভার থেকে অব্যাহতি দেয় না। মানুষ সর্বদা শয়তানের চক্রান্ত প্রতিহত করতে সক্ষম–বিশেষ করে ঈমানের ওপর দৃঢ় থেকে, আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরে এবং তাঁর অনুগত থাকার মাধ্যমে।

শয়তানের ক্ষমতার সীমা

শয়তান সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় হলো তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। কুরআন এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, শয়তানের মানবজাতির ওপর কোনো স্বাধীন কর্তৃত্ব বা জোরজবরদস্তির ক্ষমতা রয়েছে। এই নীতিটি সূরা ইব্রাহিমে (১৪:২২) সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

'আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো কতৃত্ব ছিল না, তবে আমি কেবল তোমাদের ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কোরো না, বরং নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো।'

এখানে শয়তান বিচার দিবসে স্বীকার করবে যে, সে মানুষকে অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করা ছাড়া আর কিছুই করেনি, আর মানুষ নিজ ইচ্ছায় তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

এই স্বীকারোক্তি স্বাধীন ইচ্ছা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে এক প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে। মানুষ তার অপকর্মের জন্য কেবল শয়তানকে দায়ী করে পার পেতে পারে না; কারণ তার প্রভাব কেবল প্ররোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরম ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ, এবং ঈমানদারদের শয়তানের প্রভাব থেকে সুরক্ষার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে:

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা রাখে, তাদের ওপর তার (শয়তানের) কোনো কর্তৃত্ব নেই।' (সূরা আন-নহল: ৯৯)

তদনুসারে, কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্ধ ভাগ্যে বিশ্বাস (জবরিয়া মতবাদ) এবং দ্বৈতবাদ–উভয়কেই এড়িয়ে চলে। শয়তান কেবল এক পরীক্ষক হিসেবে কাজ করে, ঐশ্বরিক ক্ষমতার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়। ফলে নৈতিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজের কাঁধেই বর্তায়।

শয়তানের কুরআনিক চিত্রায়ণ একটি বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সাধন করে। ইবলিসকে মন্দের কোনো স্বাধীন উৎস হিসেবে নয়; বরং এমন এক সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে অহংকারী হয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছিল, এবং যার প্রভাব কেবল মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে

আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও উপসংহার

কুরআন শয়তানের প্রভাব প্রতিহত করার ব্যবহারিক উপায়ও নির্দেশ করেছে, যার প্রধান মাধ্যম হলো আল্লাহর জিকির এবং তাঁর নিকট পানাহ চাওয়া:

'অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।' (সূরা আন-নহল: ৯৮)

এই অভ্যাসগুলো আত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং প্রলোভন প্রতিহত করতে মুমিনের আত্মবল শক্তিশালী করে। কোনো অহেতুক ভয় জাগানোর পরিবর্তে, কুরআন সচেতনতা, নৈতিক শৃঙ্খলা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার ওপর আস্থার তাগিদ দেয়।

পরিশেষে, শয়তানের কুরআনিক চিত্রায়ণ একটি বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সাধন করে। ইবলিসকে মন্দের কোনো স্বাধীন উৎস হিসেবে নয়; বরং এমন এক সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে অহংকারী হয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছিল, এবং যার প্রভাব কেবল মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তার ভূমিকা জীবনকে এক নৈতিক পরীক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করে, পাশাপাশি আল্লাহর পরম সার্বভৌমত্ব এবং আনুগত্য বা অবাধ্যতা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতাকে পুনর্ব্যক্ত করে।

শয়তানকে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব এবং মানবীয় দায়িত্বের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে, কুরআন মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত করেছে। মূল শিক্ষাটি খুবই স্পষ্ট : শয়তান প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করতে পারে, কিন্তু নৈতিক কর্মের চূড়ান্ত দায় মানবজাতির নিজস্ব কাঁধেই থাকে–যাদের আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত কামনা করতে এবং ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ■

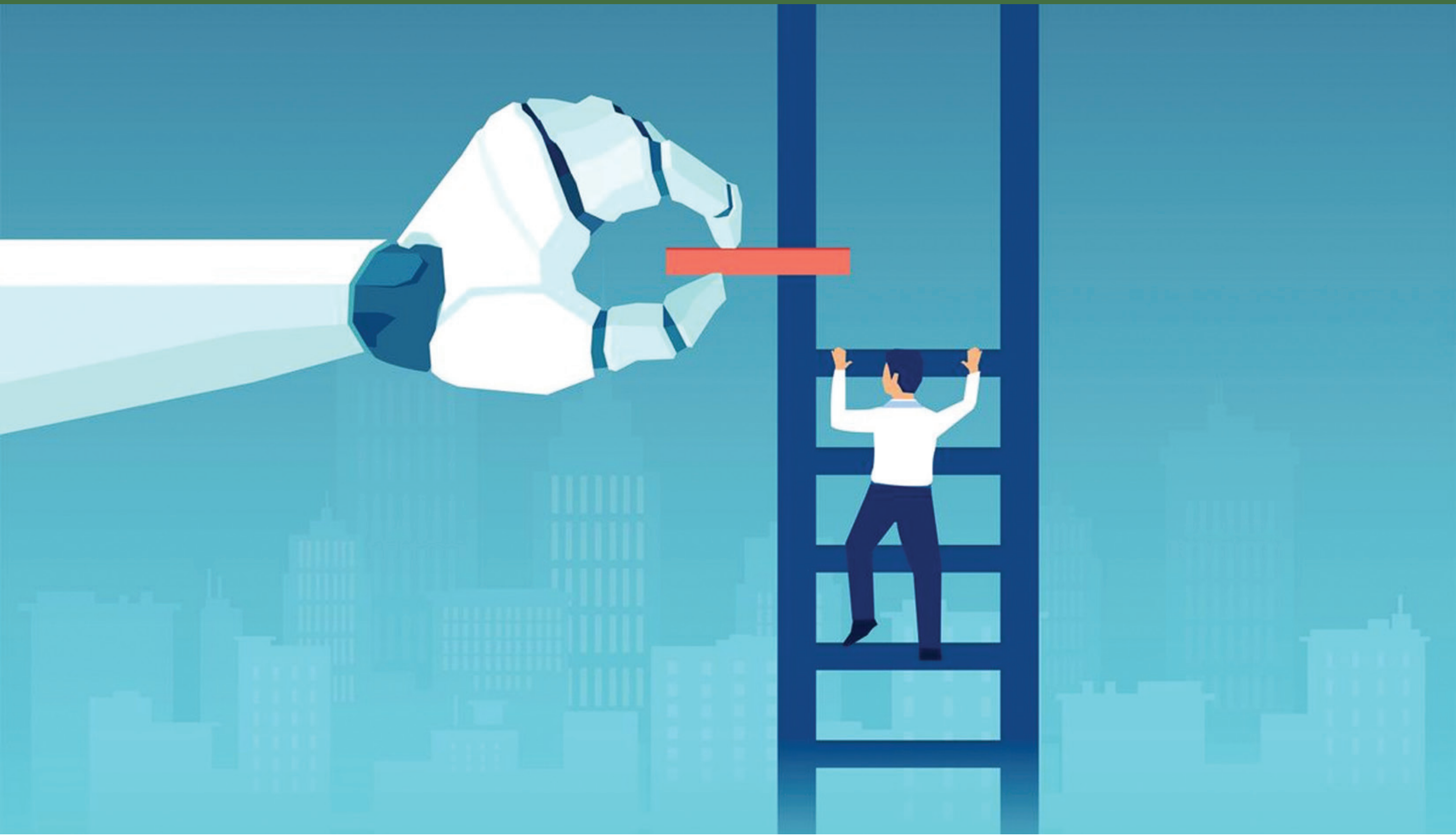

মানবতার নিয়ন্ত্রণ : ম্যাকিয়াভেলি থেকে স্মার্ট অ্যালগরিদম

"আধুনিক ক্ষমতা কেবল শরীরের ওপর দমন-পীড়নের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না; বরং তা এমন জ্ঞান তৈরির ক্ষমতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যা মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে এবং প্রজা বা জনগণকে দিকনির্দেশনা দেয়।"

– **মিশেল ফুকো** (প্রযুক্তি ও নজরদারি প্রসঙ্গে)

মোহাম্মদ বেরো
সিরীয় গবেষক ও 'সাদা সার্ভে সেন্টার'-এর পরিচালক

'যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কেবল সততা ও নৈতিকতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, অসংখ্য অসৎ মানুষের ভিড়ে তার ধ্বংস অনিবার্য।' আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে এই নির্মম সত্য উচ্চারণ করে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। মানবচিন্তার ইতিহাসে নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মাঝে দূরত্ব তৈরির অন্যতম সংকটময় মুহূর্ত ছিল এটি। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে নানা ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই দূরদর্শিতা এক কার্যকর রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়। পরিণত হয় স্বৈরাচারীদের এমন এক আচরণবিধিতে, যারা মানবজাতির গর্দান, মন, সম্পদ ও ভাগ্যকে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনো কসুর করে না।

ইতালীয় দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) নাম এলেই সাধারণত একটি মূলনীতির কথা মনে পড়ে, যা তাঁর দর্শনের চরম উপযোগিতাবাদী ও কঠোর বাস্তববাদী রূপটিকে প্রকাশ করে : 'উদ্দেশ্যই মাধ্যমকে বৈধতা দেয়।' রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁর বিরোধীরা এই সুনির্দিষ্ট নীতিকে—যা রাজনৈতিক বাস্তববাদের প্রধান খামতি হিসেবে বিবেচিত—বিভিন্ন আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে নানা গ্রহণযোগ্য রূপে হাজির হতে দেখেছেন। এমনকি এর সমর্থকেরাও এই নীতিকে আড়াল বা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং এটি 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থ', 'জরুরি প্রয়োজনের কোনো আইন নেই', 'জনকল্যাণ', 'বিপ্লবী বৈধতা', 'জাতীয় স্বার্থ' কিংবা 'ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সমষ্টিগত স্বার্থের অগ্রাধিকার'—এমন নানা আকর্ষণীয় সংজ্ঞার আড়ালে বারবার আত্মপ্রকাশ করে।

অনেকে 'দ্য প্রিন্স' (The Prince) গ্রন্থটিকে শাসকের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং সেই নিয়ন্ত্রণে যেকোনো চ্যালেঞ্জ গুঁড়িয়ে দেওয়ার কর্তৃত্ববাদী মডেলের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে মানবচিন্তার ইতিহাস এমন অনেক পূর্বসূরির চিন্তায় সমৃদ্ধ, যা ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স'-এর তাত্ত্বিক ভিত্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। ম্যাকিয়াভেলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের থেকে অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। রাজনৈতিক বাস্তববাদের পেছনে তাকালে এমন বেশ কিছু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়:

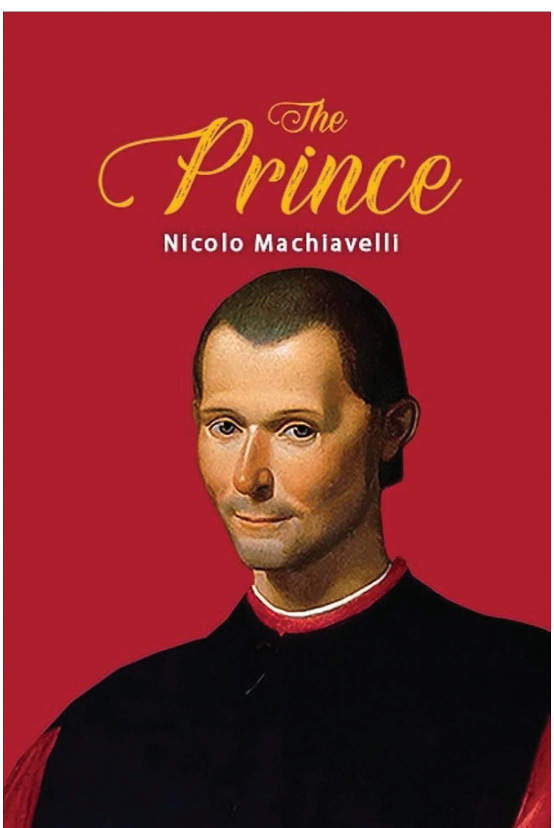

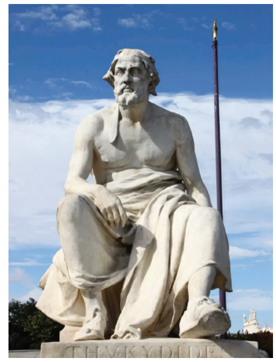
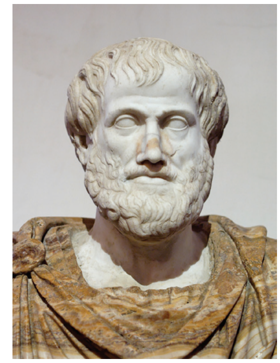
থুসিডাইডিস ও অ্যারিস্টটল

থুসিডাইডিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৪০০) : এথেনীয় দার্শনিক ও সামরিক কমান্ডার, যাকে 'রাজনৈতিক বাস্তববাদের জনক' মনে করা হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে চিন্তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছিলেন : 'শক্তিশালীরা যা করার ক্ষমতা রাখে তা-ই করে, আর দুর্বলরা বাধ্য হয়ে তা সহ্য করে।' এটিই নৈতিকতাহীন আদিম ক্ষমতার পক্ষে মানবজাতির প্রথম দলিলবদ্ধ যুক্তি—এমন এক রাজনৈতিক অস্ত্র যা কোনো শাসকই হাতছাড়া করতে চান না।

অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) : 'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে 'প্রথম শিক্ষক' অ্যারিস্টটল বিশ্লেষণ করেছিলেন শাসকেরা কীভাবে তাঁদের সিংহাসন টিকিয়ে রাখেন। তবে একই সঙ্গে তিনি শাসনকাজে নৈতিকতাহীনতার সমালোচনাও করেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি পরবর্তীতে অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষণ থেকে সেই নৈতিক সমালোচনা অংশটুকু ছেঁটে ফেলে সেটিকে একটি নির্ভেজাল ও কার্যকর নির্দেশিকায় রূপান্তরিত করেন।

ইবনু খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) : বাস্তববাদী রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের এই অগ্রপথিক প্রায়ই এমন দুটি সমান্তরাল পথের কথা বলতেন যা কখনো মেলে না। তাঁর 'আসাবিয়্যাহ' (সামাজিক সংহতি) তত্ত্ব—যা রাজকীয় ক্ষমতা ও শাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতা বা ধর্মীয় বৈধতার চেয়ে গোষ্ঠীগত সংহতিকে প্রাধান্য দেয়—তা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি। তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতার চাকার বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করেছেন: ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা এবং পতন। ইবনু খালদুনের পর বহু শাসক এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে—ক্ষমতা কেবল নিজের দলীয় সংহতি রক্ষা করেই স্থায়ী করা যায় না, বরং প্রতিপক্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে এবং জাতির ঐক্য নষ্ট করে রাজপ্রাসাদের গোষ্ঠীগত ক্ষমতাকে ভারী করার মাধ্যমেও তা অর্জিত হয়।

উপরের সব দৃষ্টান্তই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, যার ওপর ভর করে ক্ষুদ্র আমীরতন্ত্র থেকে শুরু করে বিশাল সাম্রাজ্য ও আধুনিক রাষ্ট্র পর্যন্ত সব ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী তাদের নীতি সাজিয়ে এসেছে: তা হলো পরম নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা এবং যেকোনো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বা বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে চিরতরে নস্যাৎ করা। অথচ পরম নিয়ন্ত্রণের এই আকাঙ্ক্ষা ইতিহাস ও

ইবনু খালদুন

প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মের পরিপন্থী। উৎকর্ষ ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছালেই ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়ে যায়। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে প্রকৃতির নিয়ম এমনই; এই কারণেই বড় বড় নগর ও সভ্যতাকে আরবিতে 'দুওয়াল' (Duwal–যার মূল অর্থ 'আবর্তন বা পরিবর্তন') বলা হয়। কারণ কোনো সভ্যতাই স্থায়ী নয়, সময়বহে সবগুলোরই রূপান্তর, পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।

ম্যাকিয়াভেলি ও তাঁর পূর্বসূরিদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরম ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ অর্জনের এই প্রতিযোগিতা কখনোই থামেনি। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে চতুরতার সাথে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা দেখলে যেকোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বিস্মিত হবেন–কীভাবে তারা ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে মানুষের চিন্তা ও সময়কে জয় করে নিয়েছে। বর্তমান শাসকযন্ত্রের অর্জনের তুলনায় ম্যাকিয়াভেলি ও তাঁর পূর্বসূরিদের ধ্যানধারণাকে অত্যন্ত প্রাথমিক ও আদিম রূপ বলে মনে হবে। আধুনিক 'অ্যালগরিদমিক প্রিন্স'-এর অন্যতম বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য হলো এর সীমানাহীন ও বৈশ্বিক প্রভাব–যা চিরাচরিত ম্যাকিয়াভেলিয়ান শাসকের মতো কোনো নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সীমানায় বন্দি নয়।

নিয়ন্ত্রণের বিবর্তন: রাজা থেকে অ্যালগরিদম

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগ, প্রসারিত সীমানা, বিপুল জনসংখ্যা এবং নিজের ঘরে বসেই মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের যোগাযোগ ও চিন্তাকে প্রভাবিত করার সক্ষমতার যুগে–উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অর্জন করা শাসকশ্রেণির জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এই বিপুল জনস্রোত শৃঙ্খল ভেঙে এমন এক সুনামি তৈরি করত যা সব বিদ্যমান কাঠামো ভাসিয়ে নিত। মানুষের বাড়তে থাকা সক্ষমতা এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক শক্তির এই সম্পর্কের সাথে যানবাহনের গতির মিল রয়েছে : গতি যত বাড়ে, দুর্ঘটনা এড়াতে ব্রেকিং মেকানিজম বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেও তত শক্তিশালী হতে হয়।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বিরল কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত তথ্য ও জ্ঞানের ওপর একচেটিয়া আধিপত্যের মাধ্যমে। নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে সেই ব্যতিক্রমগুলো কীভাবে ঘটেছিল, নাকি কোনো সহিংস পরিবর্তন ও কঠোর আইন চাপিয়ে দেওয়ার বৈধতা তৈরির জন্য কৃত্রিম শত্রু হিসেবে সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল–তা নিশ্চিত বলা কঠিন। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো, তথাকথিত 'মুক্ত বিশ্ব' যেভাবে তার বিপজ্জনক উদ্ভাবন 'মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'-কে ভূ-রাজনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করেছে। আস্ত একটা জাতিকে ধ্বংস করা, দমনমূলক আইন চাপিয়ে দেওয়া কিংবা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্লোগানের আড়ালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্র তৈরি করতে এই অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ছায়াতলে সাজানো বৈশ্বিক আতঙ্ক ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাব মূলত তথাকথিত সুপার-স্টেট বা পরাশক্তিগুলোর সহিংসতাকে বৈধতা দেওয়ারই পাঁয়তারা।

আজ সাধারণ মানুষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিকে সম্পূর্ণ নিখরচায় সরবরাহ করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে: প্রযুক্তিগুলো মানুষের মন ও মননকে পুনর্গঠন করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার সক্ষমতা রাখে। এই আধুনিক শাসনযন্ত্র মোকাবিলা, প্রতিরোধ কিংবা এর প্রভাব প্রশমিত করার চেষ্টা এখন আর কার্যকর নয়। আজ আমরা যে বিশ্বে বাস করছি তা এক বিচ্ছিন্ন ও ক্ষমতাচ্যুত সমাজ–যেখানে গতানুগতিক প্রোপাগান্ডা ও অপতথ্যের প্রচার আর এককভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা দ্রুত এমন এক ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছি যেখানে মানুষ বায়োলজিক্যাল রোবটে পরিণত হচ্ছে; কারণ এই অতি-উন্নত প্রযুক্তিগুলো আমাদের জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং আবেগকেও ভেতর থেকে বদলে দিচ্ছে।

আমাদের ডিজিটাল ডিভাইস থেকে প্রতি সেকেন্ডে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবাহিত বিপুল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার এক দানবীয় ক্ষমতা আজ সার্ভারগুলোর রয়েছে। নগণ্য ত্রুটির মার্জিনে তারা প্রতিটি মানুষের সুনির্দিষ্ট মানসিক ও আচরণগত প্রোফাইল তৈরি করে ফেলছে। অতীতে শাসকেরা মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ফাঁদ পাততে একের পর এক রাজনৈতিক চাল চালত। আর আজ, 'অ্যালগরিদমিক প্রিন্স' মানবজাতিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিচালিত হওয়ার উপযোগী করে গড়ছে। ব্যবহারকারী এই মেকানিজম বুঝতে পারল কি না, তাতে অ্যালগরিদমের কিছুই আসে যায় না; কোনো কৌশল প্রকাশ হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো–তা ততক্ষণে তার উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছে, আর নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালগরিদমগুলো ততক্ষণে আরও গভীর ও জটিল স্তরে প্রবেশ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, এই উন্নত অ্যালগরিদমগুলো জ্ঞানের

প্রথাগত ও বিশ্বাসযোগ্য উৎসগুলোর ওপর মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ ও জটিল উভয় বিষয়েই যেকোনো সংবাদের সত্যতা এবং মিথ্যা—দুটিই সমান বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে থাকে। এক দলের মতে গম শত রোগের কারণ, আবার অন্য দলের মতে এটি সুষম খাদ্যের অপরিহার্য অংশ। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কি মানবকল্যাণে এসেছে, নাকি এটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিষ্ক্রিয় বা নির্মূল করার হাতিয়ার? এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি বর্তমানের ব্যাখ্যাতীত মৃত্যুর মিছিলে দৃশ্যমান, নাকি আসল বিপর্যয় আসতে আরও সময় লাগবে? রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও একই ধরনের চরম ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। ফলে একজন সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, বুঝতে পারে না কোন দিকে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত অতি সহজেই কোনো এক ব্যবস্থার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। প্রযুক্তি 'দ্য প্রিন্স'-এর এমন এক আধুনিক সংস্করণ তৈরি করেছে, যার সামনে মূল ম্যাকিয়াভেলিয়ান সংস্করণটিকে এখন সাধারণ কোনো খামারমালিক বা ক্ষুদ্র বিক্রেতার চালচলন বলে মনে হয়।

মানুষের মূল্য ও ভুয়া স্বাধীনতার ফাঁদ

নিয়ন্ত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের এই গুণগত পরিবর্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতেও বড় পরিবর্তন এনেছে। এটি নৈতিক ও আইনি সীমানা টপকে গেছে—যা দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করত। সমাজগুলোর সামনে আজ নিজেদের মৌলিক নৈতিক অবস্থান রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই রূপান্তর এমন এক নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার জন্ম দিয়েছে যা প্রাচীন কাঠামোর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে; যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার বা নজরদারি বনাম স্বাধীনতার সূক্ষ্ম ভারসাম্যের কোনো স্থান নেই। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থায় মানুষকে এক নিছক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, যার অর্থনৈতিক মূল্য মাপা হয় মাইক্রোচিপ ও ডিজিটাল অর্থনীতির বাজারে। মানুষ—এমনকি 'বর্জিত ও শোষিত মানুষ'ও—এখন বন্ড মার্কেটের এমন সম্পদে পরিণত হয়েছে, যা শেয়ারবাজারের অনিয়ন্ত্রিত গতিতে ওঠা-নামা করে।

বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শ্বাসরুদ্ধকর বিস্তার ও নেপথ্যের নিয়ন্ত্রকদের হাত ধরে আমরা যে ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি, তাতে মানুষ পরিণত হবে এক বাধ্য প্রাণীতে—যে সুপার কম্পিউটিং সিস্টেমের দেওয়া সংকেত অনুযায়ী অন্ধের মতো চলবে। এই প্রযুক্তিগুলোকে সবচেয়ে 'স্মার্ট' প্রজন্মের হাতিয়ার হিসেবে বাজারজাত করা হয়। অথচ মানুষের জীবনকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে একধরনের স্বয়ংক্রিয় অভ্যাসের শৃঙ্খলে বন্দি করা হয়েছে, যা স্বাধীন পছন্দের এক ভুয়া অনুভূতি দেয়। বাহ্যিকভাবে মুক্ত মনে হলেও মানুষ আসলে এক কৃত্রিম সম্মোহনে পরিচালিত ঘুমন্ত পথিকের (Sleepwalker) মতো কাজ করে। আরও সামনে তাকালে দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলো যখন মানুষের নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে স্বায়ত্তশাসিত হয়ে উঠবে, তখন সেই প্রযুক্তিগত পরানির্ভরতাকে মেনে নেওয়ার জন্যই সমাজকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের ক্ষোভ বা প্রতিবাদ গিয়ে পড়বে কোনো অনুভূতিহীন অ্যালগরিদমের ওপর; আর পর্দার আড়ালে থাকা আসল নিয়ন্ত্রকেরা থেকে যাবে নিরাপদ দূরত্বে।

কাগজি মুদ্রা ও ধাতব অর্থ হয়তো আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া স্বাধীনতার সর্বশেষ বস্তুগত হাতিয়ার। অনিয়ন্ত্রিত লেনদেন ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রোখার অজুহাতে এগুলোকে এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে আনা হচ্ছে। অ্যালগরিদমিক সিস্টেমের মাধ্যমে এক ক্লিকেই যেকোনো ব্যক্তির সম্পদ ফ্রিজ বা ব্লক করে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে ভোক্তা হিসেবে মানুষ এতটাই অসহায় হয়ে পড়বে যে, কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেত ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ কেনা বা বাড়িভাড়া দেওয়ার ক্ষমতাও তার থাকবে না। সংবিধানে স্বীকৃত 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র ধারণাটি তার মূল কার্যকারিতা হারিয়ে কেবল ফাঁকা স্লোগানে পরিণত হবে—যেখানে এই সর্বব্যাপী 'সিস্টেম'-এর কাছে আত্মসমর্পণ করাই টিকে থাকার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার পশ্চিমা মডেলে সামাজিক সুরক্ষার শেষ দুর্গ—'পরিবার' ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার মাধ্যমেই এই দাসত্বের পথ প্রশস্ত করেছিল। সমাজগুলো আজ এমন এক এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে যা ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধন, সামাজিক দায়িত্ব ও মৌলিক পরিচয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাকে 'সিস্টেম'-এর অনুগত দাসে পরিণত করে। আর এই 'সিস্টেম' পরিচালনা করে যুদ্ধ, সম্পদ, নির্বাচন, ক্ষমতার রাজনৈতিক ভারসাম্য, তেল ও স্বর্ণের দাম এবং অন্যান্য বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল নিয়ামকগুলোকে—যার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল সাধারণ মানুষের পক্ষে আঁচ করাও প্রায় অসম্ভব।

এটিই কি মানবতার শেষ পরিণতি, নাকি নতুন কোনো ভারসাম্যের অপেক্ষা?

পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ইতিহাস সবসময় এই সত্যকেই প্রমাণ করেছে যে, প্রতিটি মহামারীরই প্রতিষেধক থাকে—'এমনকি শক্ত লোহাকেও রেত বা শাণ দেওয়ার যন্ত্র দিয়ে কাটা যায়'। কোনো একক সাইবার-ক্ষমতার কাছে মানবতার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই কঠিন বাস্তবতার বিপরীত মেরুতে কিছু সচেতন শক্তি এবং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ম কাজ করে থাকে—যা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার চাকা ভেঙে দিতে সক্ষম। তা মানব ও প্রকৃতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই নতুন কোনো দ্বন্দ্বে জন্ম দেবে।

স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রবক্তাদের জন্য এখনো এমন কিছু পথ খোলা রয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁরা এই সম্ভাব্য বিপর্যয়কর রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। চরম সত্যটি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে : জীবন ও তার চিরন্তন প্রবাহ নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে যাবে। অতীতেও মানবজাতি তার নিজেদের হাতেই সেইসব পরম স্বৈরাচার ও পরাশক্তিকে ধূলিসাৎ করেছে, যারা মানুষের মৌলিক অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। ■

অর্থ ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনতা যেন এক অসম্পূর্ণতার নাম

অর্থ ও উদ্দেশ্যের যৌথ অনুধাবন ছাড়া আমাদের জৈবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মৌলিকভাবেই অসম্পূর্ণ

আসরার তালুকদার, পিএইচডি
সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
পার্থ, অস্ট্রেলিয়া

সারসংক্ষেপ

আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনবিধান ‘দ্বীন-উল-ফিতরাত’ স্বাধীনতার পথে কোনো বাধা নয়; বরং তা স্বাধীনতাকে প্রদান করে সঠিক দিক, অর্থ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। এই সুরক্ষার ওপর ভর করেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ টেকসইভাবে বিকশিত হতে পারে।

> *“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া–যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।”*
>
> – আল-কুরআন (৩০:২১)

"অতএব, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো–আল্লাহর সেই স্বাভাবিক বিধান (ফিতরাত), যার ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

– আল-কুরআন (৩০:৩০)

কোরআনের এই আয়াতগুলো যে প্রজ্ঞাময় সত্য তুলে ধরে তা হলো–মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও পছন্দের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো সামাজিক ব্যবস্থা নয়। এগুলো মানবজাতির মৌলিক স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থার (ফিতরাত) এক সুসংহত ও বহুমাত্রিক অংশ, যা মানুষের অস্তিত্বকে দান করে সুস্পষ্ট দিক, উদ্দেশ্য ও জীবনবোধ।

মানবসম্পর্কের এই প্রগাঢ় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হলে একে জীববিজ্ঞান, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রযুক্তির আধুনিক পরিবর্তনের আলোকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

১. জৈবিক অনুশাসন (Biology)

মানব প্রজনন ও বংশরক্ষায় নারী ও পুরুষের জৈবিক বিনিয়োগ এক নয়। প্রকৃতি ও জীববিজ্ঞান উভয়ের জন্য পৃথক প্রজনন ভূমিকা নির্ধারণ করেছে।

নারীর প্রজনন ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় চক্রের অধীন, যা তাঁর ব্যক্তিগত সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গর্ভধারণ কেবল ক্ষণস্থায়ী যৌন আকর্ষণের ওপর নির্ভরশীল নয়; ইচ্ছা বা আকর্ষণের বাইরেও জৈবিক নিয়মে গর্ভধারণ ঘটে। এ ছাড়া নারীর প্রজনন সক্ষমতা নির্দিষ্ট বয়স ও শারীরিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব এবং পরবর্তী সময়ে লালন-পালনে নারীকে দীর্ঘমেয়াদি জৈবিক মূল্য দিতে হয়। তাই খাঁটি জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সফলতা নিহিত সঠিক সঙ্গী নির্বাচন ও দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বে।

অপরদিকে, পুরুষের প্রজনন ভূমিকা ভিন্ন। পুরুষের জৈবিক বিনিয়োগ নারীর তুলনায় কম সীমাবদ্ধ এবং প্রজনন সক্ষমতার সময়সীমাও তুলনামূলক দীর্ঘ।

তবে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবসন্তানকে দীর্ঘকাল ধরে সুরক্ষা, খাদ্য ও যত্নের ওপর নির্ভর করতে হয়। জীববিজ্ঞান প্রজননকে সম্ভব করলেও পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক দায়িত্বকে এককভাবে সামলাতে পারে না। ঠিক এখান থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবার ও সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

২. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট (Socio-Economics)

ঐতিহ্যবাহী পরিবার হলো মানুষের জৈবিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে ওঠা একটি সফল সামাজিক অভিযোজন। বিবাহের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া এই ব্যবস্থা পরিবার ও সমাজকে টেকসই করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে।

প্রথাগত কাঠামোয় নারী মূলত সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করতেন; অন্যদিকে পুরুষ পালন করতেন উপার্জন, প্রতিরক্ষা ও সম্পদ সংস্থানের ভূমিকা। এটি কোনো বৈষম্য ছিল না, বরং ছিল পারস্পরিক পরিপূরকতা।

তবে ঐতিহাসিকভাবে নারীর অর্থনৈতিক অবদান ছিল না–এমন ধারণা ভুল। কায়িক শ্রমের প্রথাগত অর্থনীতি গৃহকেন্দ্রিকই ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর উৎপাদন ব্যবস্থা ঘর থেকে কারখানা ও অফিসে স্থানান্তরিত হওয়ায় পারিবারিক শ্রমের ভূমিকায় রূপান্তর ঘটে।

কেবল অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে পরিবারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায় না। মাতৃত্ব-পিতৃত্ব, বংশলতিকা, উত্তরাধিকার ও সামাজিক অনুগতির মতো বিষয়গুলো রক্ষা করতে সামাজিক নিয়ম ও দায়িত্ববোধের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

৩. ধর্মীয় নৈতিকতা (Religion)

ধর্ম পারিবারিক কাঠামোকে সুসংগঠিত রূপ দেয় এবং মানবিক সম্পর্কের নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ করে। ইসলামে বিবাহের বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে সমস্ত সম্পর্ককে দায়িত্বশীল বিবাহের আওতায় আনা হয়েছে। এমনকি বিবাহিত জীবনের ভেতরেও সুস্থতার স্বার্থে নির্দিষ্ট নীতি (যেমন: ঋতুস্রাবকালীন নিষেধাজ্ঞা) দেওয়া হয়েছে।

এই বিধানগুলোকে কেবল বাধা হিসেবে দেখলে ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক অবদানকে ছোট করা হয়। ধর্ম প্রবৃত্তি ও প্রথাগত আচরণকে দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি ও স্থায়ী বন্ধনে রূপান্তর করে সামাজিক অনিশ্চয়তা দূর করে।

যেখানে বহুবিবাহের অনুমোদন রয়েছে, সেখানেও তা কঠোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার শর্ত সাপেক্ষ। ফলে ধর্ম ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তি পরিচালনা করে একটি সুশৃঙ্খল টেকসই সমাজব্যবস্থা গঠন করে।

৪. আধ্যাত্মিক প্রশান্তি (Spirituality)

কোরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে রূপক অর্থে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে:

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'

পোশাক যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রক্ষা করে এবং তার সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে; স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কও তেমনি একে অপরের জন্য প্রতিরক্ষা, প্রশান্তি ও মর্যাদার উৎস।

এই বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর উন্মুক্ত, সংবেদনশীল এবং নির্ভরশীল। কুরআন পরিবারের মূল ভিত্তি হিসেবে 'ভালোবাসা, দয়া ও প্রশান্তি'কে চিহ্নিত করেছে। ধর্মীয়

আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক জীবনবিধান 'দ্বীন-উল-ফিতরাত' মানুষের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় নয়, বরং তা স্বাধীনতাকে প্রদান করে সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্থায়িত্ব। আর এই সমন্বিত বিধানের মাধ্যমেই ব্যক্তি, পরিবার ও বিশ্বসমাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে টিকে থাকতে পারে।

আধ্যাত্মিকতা পরিবারকে স্রেফ প্রজনন সংস্থা থেকে তুলে এনে আত্মিক প্রশান্তি ও নৈতিক দায়িত্বের সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করে।

৫. প্রযুক্তিগত রূপান্তর (Technological Shift)

আধুনিককালে মানুষের পারিবারিক ও সামাজ কাঠামোতে দুটি বড় পরিবর্তন এসেছে:

১. শিল্পবিপ্লব: যন্ত্রের ব্যবহারের কারণে কায়িক পেশিশক্তির গুরুত্ব কমেছে, যা নারীদের বাইরের কর্মসংস্থানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের পথ সুগম করেছে।

২. জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি: প্রজননের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা বহু জৈবিক বাধ্যবাধকতা শিথিল বা পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রযুক্তি মানুষকে অভূতপূর্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দিয়েছে ঠিকই, তবে এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সামাজিক সংকট। বিশ্বব্যাপী নিম্ন জন্মহার, নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক ভাঙন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখন চরম আকার ধারণ করেছে।

৬. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে উদারপন্থী পছন্দ (Liberal Choice)

ঐতিহাসিকভাবে বিবাহ ছিল প্রজনন, নিরাপত্তা ও শ্রমবণ্টনের সামাজিক চুক্তি। পরবর্তীতে জৈবিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা কমে যাওয়ায় রোমান্টিক প্রেম ও ব্যক্তিগত পছন্দ বিয়ের প্রধান শর্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ ঐতিহ্যের বদলে নিজ পছন্দ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় মতামত দেওয়ার উদারনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে।

তবে পশ্চিমা সমাজসহ বিশ্বজুড়ে এখন এই উদারনৈতিক পছন্দের সীমাহীন স্বাধীনতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠছে। পছন্দের পরিধি বাড়লেও মানুষ তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত 'অর্থ ও উদ্দেশ্য' খুঁজে পাচ্ছে না। বরং স্বাধীনতার নামে বাড়ছে বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতা এবং চরম পারিবারিক অনিশ্চয়তা।

রূপান্তর ও শেষ কথা

জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছা সত্ত্বেও আজ ভয়াবহ জনসংখ্যা হ্রাস ও সামাজিক সংকটে নিমজ্জিত। এই সংকট উত্তরণে অভিবাসনের ওপর জোর দেওয়া হলেও তা নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতির ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা তৈরি করছে।

তাই সেই চিরন্তন প্রশ্নটি আবার সামনে আসে:

জীববিজ্ঞান যদি জীবনকে সূচনা করে, সমাজ যদি তাকে রূপ দেয়, ধর্ম যদি তাকে স্থায়িত্ব দান করে এবং আধ্যাত্মিকতা যদি তাকে অর্থপূর্ণ করে–তবে এসব মূল ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়লে মানুষের পরিণাম কী হবে?

পছন্দ ও স্বাধীনতার নামে মানুষ যখন দায়িত্ব ও প্রাকৃতিক বিধান অস্বীকার করে, তখন সেই স্বাধীনতা মানবজাতিকে কোথায় নিয়ে যায়?

অর্থ ও উদ্দেশ্যের যৌথ অনুধাবন ছাড়া আমাদের জৈবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত একটি অর্থহীন অসম্পূর্ণতায় রূপ নেয়। আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক জীবনবিধান 'দ্বীন-উল-ফিতরাত' মানুষের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় নয়, বরং তা স্বাধীনতাকে প্রদান করে সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্থায়িত্ব। আর এই সমন্বিত বিধানের মাধ্যমেই ব্যক্তি, পরিবার ও বিশ্বসমাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে টিকে থাকতে পারে। ■

**সতর্কবার্তা: নিবন্ধটি পবিত্র কোরআনের নৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের আলোকে একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা। এটি কোনো ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ফতোয়া বা আলেমদের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং কোরআনিক ভাবধারার যৌক্তিক বিশ্লেষণমাত্র।*

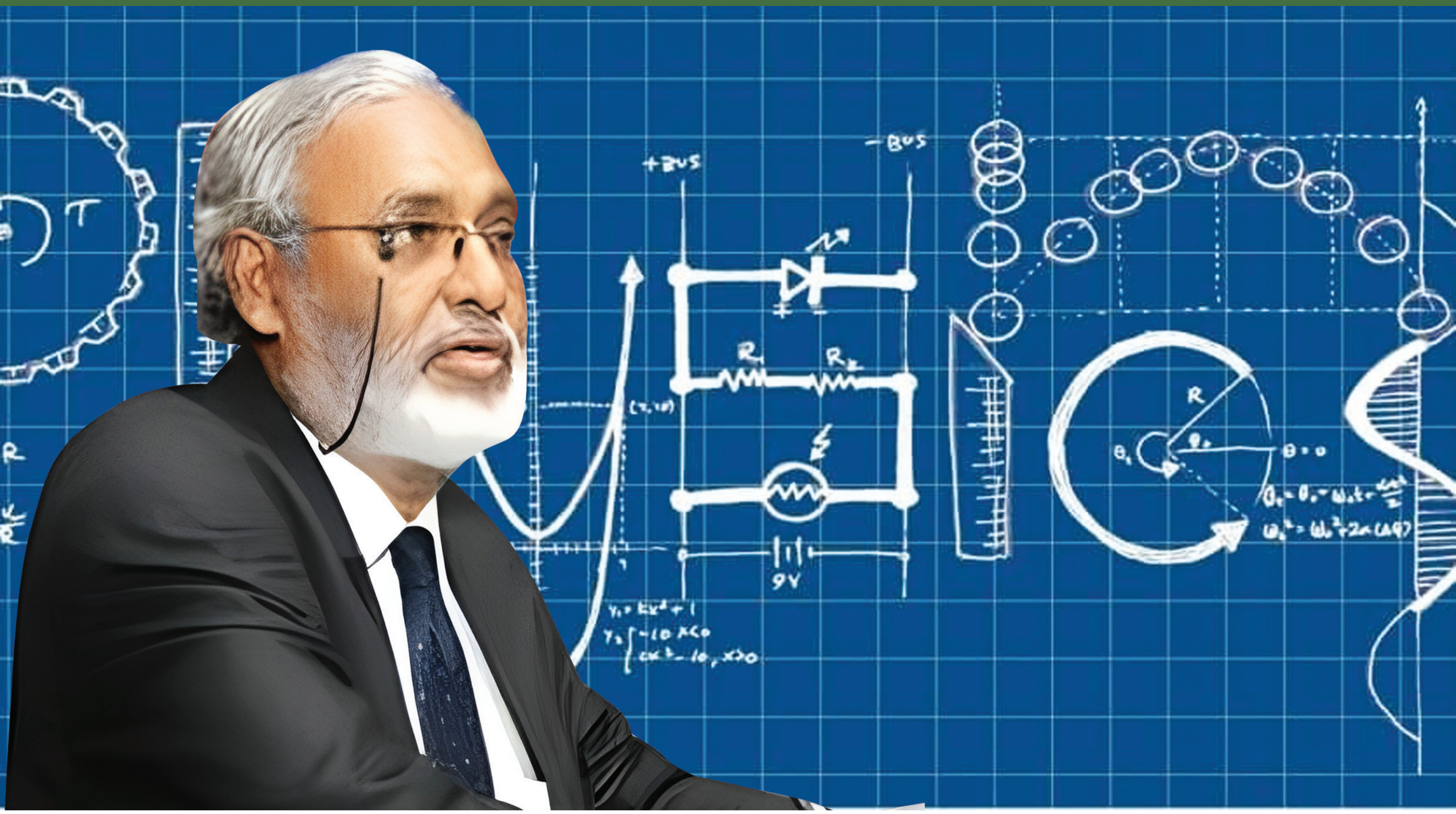

‘আলী-বডমার পটেনশিয়াল’ থেকে বিশ্বমঞ্চে:

বাঙালি পরমাণু বিজ্ঞানী শমসের আলীর অনন্য যাত্রা

আল উম্মাহ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও চিন্তাবিদ মরহুম আল্লামা প্রফেসর ড. এম. শমসের আলী ছিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৩৭ সালে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল যশোরের বসুন্দিয়ায়। তাই বসুন্দিয়ার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন গর্ব, অনুপ্রেরণা ও কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অঙ্গনে অনন্য অবদান

প্রফেসর ড. এম. শমসের আলীর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর একটি হলো পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা। ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এ. আর. বডমারের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের যৌথ গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী ‘আলী-বডমার পটেনশিয়াল’ নামে পরিচিত।

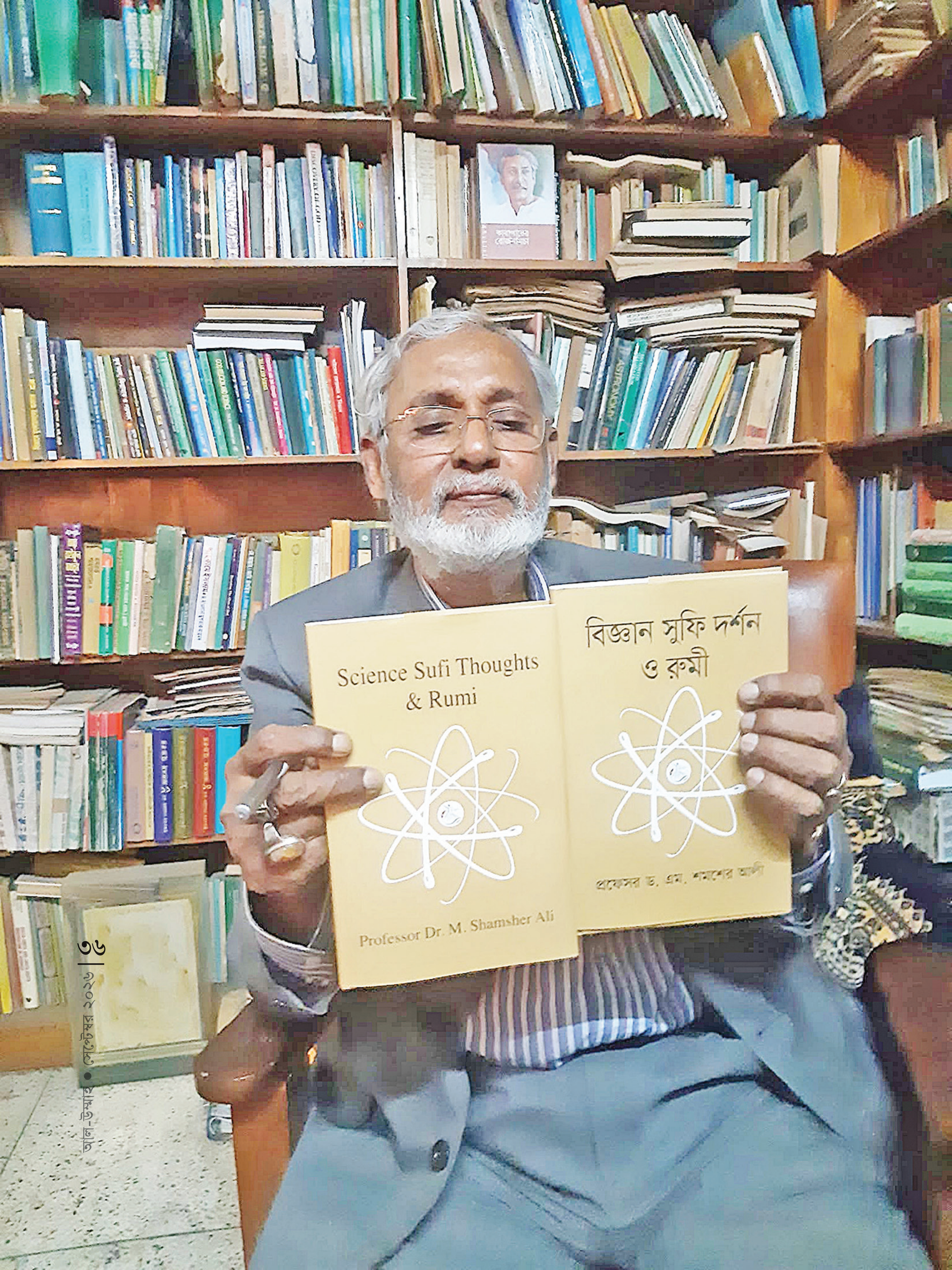
Science Sufi Thoughts
& Rumi
Professor Dr. M. Shamsher Ali
বিজ্ঞান সুফি দর্শন
ও রুমী
প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষায় এই তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের পাঠ্যক্রমেও এটি পড়ানো হয়। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এই অবদান তাঁকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সমাজে বিশেষ মর্যাদা এনে দেয়।

কর্মময় জীবন

প্রফেসর ড. এম. শমসের আলীর কর্মজীবন ছিল বহুমাত্রিক ও সাফল্যে সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি দেশের উচ্চশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালে তিনি আনবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ২০০২ সালে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা

বিজ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা ও ইসলামি চিন্তাচর্চায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর ড. এম. শমসের আলী বিভিন্ন সময়ে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'অনারারি প্রফেসর অব ফিজিক্স' মর্যাদা প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে তিনি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হরি প্রসন্ন রায় স্বর্ণপদক'। এছাড়া তিনি মাদার তেরেসা স্বর্ণপদক, যুক্তরাজ্যের ওয়াল ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের সর্বোচ্চ ফেলোশিপ, জগদীশ চন্দ্র বসু স্বর্ণপদক, মওলানা ভাসানী স্বর্ণপদক এবং ২০০৫ সালে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বিজ্ঞান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা ও চিন্তাচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পক্ষ থেকে তিনি 'আল্লামা' উপাধিতেও ভূষিত হন।

বিজ্ঞান ও ইসলাম নিয়ে বহুমাত্রিক চিন্তাচর্চা

প্রফেসর ড. এম. শমসের আলীর চিন্তার পরিধি শুধু পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞান, ইসলাম, দর্শন, সংস্কৃতি, সুফিবাদ, গণিত ও সমকালীন নানা বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আলাউদ্দীন'স রিয়েল ল্যাম্প' (২০১৩), 'ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন' (২০১৪), 'সমসাময়িক কিছু প্রসঙ্গ: ইসলামের আলোকে ভাবনা' (২০১৫), 'ইসলাম সাইন্স অ্যান্ড কালচার' (২০১৭), 'মেকিং ম্যাথ ফান' (২০১৮), 'ভাষার ভিতরে ভাষা' (২০১৯),

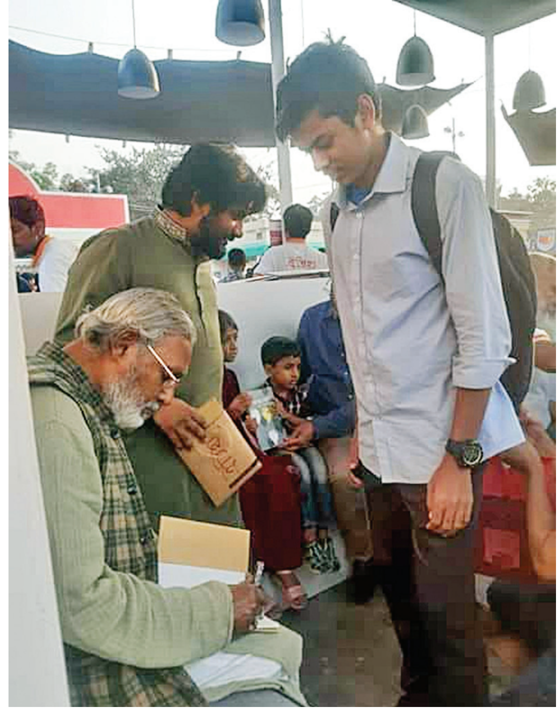

বইমেলায় অটোগ্রাফ দিচ্ছেন প্রফেসর ড. এম. শমসের আলী

'বিজ্ঞান, সুফি দর্শন ও রুমী' (২০২০), 'ইসলাম অ্যান্ড সাম কনটেম্পোরারি ইস্যুজ' (২০২০), 'রিডিসকভার ইসলাম' (২০২১), 'ইসলামকে নতুন করে জানুন' (২০২৩), 'বিদ্রোহী কবির কথনে বিজ্ঞানের বসতি' (২০২৪), 'ইসলাম ও সাম্প্রতিক বিজ্ঞান' (২০২৫) এবং 'ইসলাম, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' (২০২৫)।

বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক, সমকালীন বিশ্ব, ইসলামি দর্শন, সংস্কৃতি এবং মানবজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর প্রকাশনাগুলো পাঠক ও চিন্তাশীল মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান

প্রফেসর ড. এম. শমসের আলী ছিলেন একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও চিন্তাবিদ। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গবেষণার পাশাপাশি ইসলাম, দর্শন ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর বহুমাত্রিক চিন্তাচর্চা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

যশোরের বসুন্দিয়ার এই কৃতী সন্তান তাঁর জ্ঞান, গবেষণা ও সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর কর্মময় জীবন ও অবদানের পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে, তাঁকে নিয়ে যতই আলোচনা করা হোক, তাঁর কৃতিত্বের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন যেন শেষ হওয়ার নয়।

২০২৫ সালের ৩ আগস্ট এই বরেণ্য বিজ্ঞানী ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটে। তবে তাঁর গবেষণা, জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যকর্ম ও চিন্তার উত্তরাধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দীর্ঘদিন অনুপ্রাণিত করবে। জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি তাঁর যে নিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে যে সেতুবন্ধন তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তা তাঁকে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। ■

স্রেব্রেনিৎসা ট্র্যাজেডির ৩১ বছর স্মরণে লন্ডনে আলিজা

ইজেতবেগোভিচের বইয়ের নতুন সংস্করণ উন্মোচন

আল উম্মাহ প্রতিবেদন

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক ও দেশটির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি আলিজা ইজেতবেগোভিচের বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ ইসলাম: বিটুইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট (ইসলাম: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে)-এর নতুন ও পরিমার্জিত ইংরেজি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে লন্ডনে। একই অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়েছে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ৩১তম বার্ষিকী।

২০২৬ সালের ১০ জুলাই (শুক্রবার) লন্ডন মুসলিম সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চার শতাধিক অতিথি অংশ নেন। দ্য কর্ডোবা ফাউন্ডেশন ও আলিজা ইজেতবেগোভিচ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এবং কেতেবে পাবলিশিংসহ

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এতে বিপুলসংখ্যক তরুণের পাশাপাশি তুরস্ক থেকে আসা একটি প্রতিনিধিদলও অংশ নেয়। অনুষ্ঠানটি কর্ডোবা ফাউন্ডেশনের ইউটিউব ও ফেসবুক চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সন্ধ্যার শুরুতেই বইটির প্রায় ৩০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দ্য কর্ডোবা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আবদুল্লাহ্ ফালীক। স্রেব্রেনিৎসার ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচারের পক্ষে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কাজ করা ফালীক ইজেতবেগোভিচের বইটিকে মানবতা, চেতনা ও নৈতিকতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে একটি অনন্য অবদান হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, অনেকের শৈশব কেটেছে এই বই পড়ে। এতে ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে নয়, বরং মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সংঘাত, উত্তেজনা ও উগ্র ডানপন্থার উত্থানের প্রেক্ষাপটে বইটির প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন ব্রিটেনের বসনীয় ইসলামিক কমিউনিটির প্রধান ইমাম এবং বসনিয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ইমাম সেদিন শাহমান। এরপর যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনীয় রাষ্ট্রদূত এইচ.ই. ওসমান তোপচাগিচ উদ্বোধনী বক্তব্য দেন।

যুদ্ধের সময় এবং ডেটন শান্তি আলোচনার সময় রাষ্ট্রপতি ইজেতবেগোভিচের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, কঠিন সেই দিনগুলোতে তিনি এমন একজন রাষ্ট্রনায়ককে কাছ থেকে দেখেছেন, যিনি শুধু কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর নয়, বরং সব মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ নিয়ে চিন্তা করতেন। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তার পেছনে ইজেতবেগোভিচের কাজ ও ত্যাগের বড় ভূমিকা রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলেন রাষ্ট্রপতি ইজেতবেগোভিচের কন্যা এবং আলিজা ইজেতবেগোভিচ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাবিনা বেরবেরোভিচ। স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ৩১তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি গণহত্যার শিকার মানুষ ও তাঁদের স্বজনদের স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, ৩১ বছর পরও হাজার হাজার নারী ও শিশু তাঁদের বাবা, ভাই ও স্বামীকে হারানোর বেদনা বহন করছেন। এত বড় নির্মমতার পরও জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন, স্রেব্রেনিৎসার নারীরা তার অনন্য উদাহরণ। তাঁরা ভুক্তভোগীর পরিচয় ছাড়িয়ে আজ নায়কে পরিণত হয়েছেন এবং গর্ব ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের বড় করেছেন।

সাবিনা তাঁর বাবার বইটি লেখার পেছনের ঘটনাও তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাইস্কুলে পড়ার সময় ইজেতবেগোভিচ বইটি লেখা শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে পুলিশ তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালালে তাঁর বোন পাণ্ডুলিপিটি রান্নাঘরের একটি কাঠের ক্যাবিনেটের নিচে লুকিয়ে রাখেন। প্রায় তিন দশক পর বইটির কাজ সম্পূর্ণ হয়।

১৯৮০-এর দশকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা আবার ইজেতবেগোভিচকে লক্ষ্যবস্তু বানালে ততদিনে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি কানাডায় তাঁর এক বন্ধুর কাছে নিরাপদে পৌঁছে যায়। সাবিনা স্মৃতিচারণ করে বলেন, পুলিশ যখন তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'এখন আমরা কী করব?' জবাবে ইজেতবেগোভিচ শুধু বলেছিলেন, 'বইটি প্রকাশ করো।'

ইজেতবেগোভিচ কারাগারে থাকাকালীন ১৯৮৪ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর ছেলে ও জামাতা বেলগ্রেড থেকে ট্রাক্টরের ভেতর বইয়ের কপি লুকিয়ে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সারাজেভোতে নিয়ে আসেন, যাতে পুলিশের তল্লাশি এড়ানো যায়।

সাবিনা বলেন, তিনি আশা করেন 'ইসলাম: বিটুইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' যেখানেই পড়া হবে, সেখানেই তা কল্যাণ বয়ে আনবে।

কেতেবে পাবলিশিংয়ের লন্ডন ও ইস্তাম্বুল শাখার পরিচালক এবং আর্টস অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ কনসালট্যান্ট ওমর ফারুক ইয়েনি বইটির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের পক্ষে-বিপক্ষে লেখা কোনো বই নয়; বরং মানুষ হওয়ার প্রকৃত অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তার ফসল।

তিনি বলেন, প্রকাশের চার দশকেরও বেশি সময় পরও বইটির প্রশ্নগুলো আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। ইজেতবেগোভিচ এখন শুধু বসনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি হিসেবে নয়, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবেও ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

সারাজেভোর অরোরা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বসনিয়া যুদ্ধে আহত যোদ্ধা ড. আদমির মুলাওসমানোভিচ ভিডিও বার্তায় বইটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ইজেতবেগোভিচ যে প্রশ্নটি বইটিতে তুলেছিলেন, তা লেখার সময়ের তুলনায় আজ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বইটি কেবল ধর্মীয় তত্ত্বের আলোচনা নয়; বরং বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইসলামকে অর্থবহভাবে তুলে ধরা, ব্যক্তিচিন্তার বিকাশ এবং সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তনের আহ্বান।

কেমব্রিজ মুসলিম কলেজের ডিন শায়খ অধ্যাপক আবদাল হাকিম মুরাদ ১৯৮০-এর দশকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হয়ে ইজেতবেগোভিচ ও তাঁর সহযোগীদের বিচারপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য সারাজেভো সফরের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বসনিয়ার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের গভীর এক 'সাংস্কৃতিক অন্ধত্ব'

প্রকাশ করেছিল।

মুরাদের মতে, বসনীয়দের সংগ্রাম শুধু একটি সামরিক যুদ্ধ ছিল না; এটি ছিল বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে গড়ে ওঠা এক ধরনের সাংস্কৃতিক ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই। গাজার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এর একটি মিল রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, অনেক রাজনীতিবিদ কী ঘটছে তা জানেন, বিভিন্ন প্রতিবেদন তাঁদের হাতে রয়েছে; তবুও তাঁরা নীরব থাকেন, কারণ ঘটনাগুলো তাঁদের তৈরি করা 'সাংস্কৃতিক সত্যের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইউরোপের মুসলিম সম্প্রদায়কে সতর্ক করে মুরাদ বলেন, তারা যেন আকাশে জমতে থাকা মেঘ দেখতে পাচ্ছে। বসনিয়া থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তব সত্যের মাধ্যমে মিথ্যা ও কাল্পনিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে বসনিয়া ভ্রমণ, সেখানকার ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে জানার এবং সেই ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাসের অংশ করে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট আলেম শায়খ ড. ইয়াসির ক্বাদি ভিডিও বার্তায় জানান, ১৯৯০ সালে কিশোর বয়সে তিনি প্রথম বইটি পড়েন। তাঁর মতে, চলতি শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অবদান এই গ্রন্থ, যা আল্লামা ইকবালের দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম-এর সঙ্গে তুলনীয়।

ইয়াসির ক্বাদি বলেন, বইটির গুরুত্ব শুধু এর বক্তব্যে নয়; বরং যিনি এটি লিখেছেন, তিনি নিজের চিন্তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বড় মূল্য দিয়েছেন। ইজেতবেগোভিচ কেবল একজন তাত্ত্বিক চিন্তাবিদই ছিলেন না; তিনি যুদ্ধের মধ্যেও একটি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় আগ্রহী, তাঁদের জন্য বইটি পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

'এমেল' সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও লেখিকা সারাহ জোসেফ ওবিই বইটির 'অগ্রগতি' অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ইজেতবেগোভিচ প্রশ্ন তুলেছিলেন—প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানুষের জীবনকে পাঁচ গুণ বেশি পূর্ণ, সুখী বা মানবিক করতে পারবে কি না। চার দশক পরও সেই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক।

ইউরোপে উগ্র ডানপন্থার উত্থানের প্রসঙ্গ তুলে সারাহ জোসেফ ভয়কে উপেক্ষা করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, বইটি মুসলমানদের ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং মহান ধারণায় অনুপ্রাণিত একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের

আলিজা ইজেতবেগোভিচ

তিনি বলেন, তাঁর ইমাম একদিন তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি মানুষকে হত্যা করতে পারো, কিন্তু একটি আদর্শ বা চেতনাকে হত্যা করতে পারো না।’ ড. আখতারের মতে, ইজেতবেগোভিচের দূরদর্শিতা, সাহস ও প্রজ্ঞা বসনীয় জাতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার রেখে গেছে।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শেখায়।

মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ ওয়াজিদ আখতারও বইটির সঙ্গে তাঁর শৈশবের স্মৃতি তুলে ধরেন। স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার সময় সৌদি আরবে থাকা অবস্থায় তিনি একটি মসজিদের লাইব্রেরিতে বইটি খুঁজে পান। সেখানে ইংরেজি ভাষায় মাত্র দুটি বই ছিল, যার একটি ছিল ইজেতবেগোভিচের এই গ্রন্থ।

তিনি বলেন, তাঁর ইমাম একদিন তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি মানুষকে হত্যা করতে পারো, কিন্তু একটি আদর্শ বা চেতনাকে হত্যা করতে পারো না।’ ড. আখতারের মতে, ইজেতবেগোভিচের দূরদর্শিতা, সাহস ও প্রজ্ঞা বসনীয় জাতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার রেখে গেছে।

ইজেতবেগোভিচের নেতৃত্বের একটি বিশেষ দিকও তুলে ধরেন ড. আখতার। তাঁর মতে, মুসলিম বিশ্বের দীর্ঘ ইতিহাসে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু ইজেতবেগোভিচ মৃত্যুর আগেই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উচ্চতার প্রমাণ।

সারাজেভো অবরোধের সময় আহত হওয়া বিবিসির সাবেক যুদ্ধ সাংবাদিক মার্টিন বেল অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে চলতি বছর শনাক্ত হওয়া স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ১০ জন ভুক্তভোগীর জন্য প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১১ জুলাই তাঁদের মরদেহ স্রেব্রেনিৎসায় দাফন করার কথা ছিল। ড. আবদুল্লাহ ফালীক এ সময় সারাজেভোতে বসনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতির দেওয়া জুমার খুতবার কথা স্মরণ করেন, যেখানে ধৈর্য, সততা ও দৃঢ় ঈমানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

তরুণ প্রজন্মকে স্রেব্রেনিৎসার ইতিহাস অধ্যয়নের আহ্বান জানান ফালীক। পাশাপাশি ড. এমির হাদঝিকাদুনিকের প্রকাশনা ‘স্রেব্রেনিৎসা জেনোসাইড : থার্টি ইয়ার্স লেটার: আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রিমেম্বারিং, অ্যাক্টিং’ পড়ার পরামর্শ দেন তিনি। প্রকাশনাটিতে বসনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি, বসনীয় রাষ্ট্রদূত এবং আইসিএমপি পরিচালক ক্যাথরিন বোমবার্গারের লেখা রয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষদিকে সারাহ জোসেফ সবাইকে বসনিয়া ভ্রমণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে দেশটির অর্থনীতিকে সমর্থন করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে–তাদের জীবনের গল্প কখনো যেন মুছে না যায়।

সমাপনী বক্তব্যে ড. আবদুল্লাহ ফালীক ৩১ বছর পরও প্রিয়জনের দেহাবশেষের অপেক্ষায় থাকা পরিবারগুলোর কষ্টের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্রেব্রেনিৎসাকে শুধু বছরে একদিন স্মরণ করলে হবে না। এর স্মৃতিকে জীবিত রাখতে হবে এবং সারা বছর বিশ্বজুড়ে এই গণহত্যার সত্য তুলে ধরতে হবে। ■

ধ্বংসের মুখে সভ্যতা:
বস্তুগত অগ্রগতির প্রান্তসীমায় মানবজাতি

সৈয়দ ইকবাল জহীর
পণ্ডিত ও লেখক, ভারত

১. ক্রমশ হ্রাসমান জ্বালানি ও কাঁচামালের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা ভূরাজনৈতিক সংঘাত ও সামরিক আগ্রাসনকে তীব্রতর করতে পারে।

২. সীমাহীন ভোগবাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক সভ্যতা প্রকৃতির সসীম সম্পদের কাছে বন্দি।

৩. অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং ভোগবাদী সংস্কৃতির ত্রিমুখী চাপে সম্পদ ব্যবহার হ্রাসের যে কোনো কার্যকর উদ্যোগ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৪. বিদ্যমান বস্তুবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং এর বিপরীতে একটি দায়িত্বশীল ও টেকসই বিকল্প জীবনদর্শন উপস্থাপন করতে হবে।

বিশ্ব আজ এমন এক গভীর অবক্ষয়ের মুখোমুখি, যা মানবজীবন ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণকারী বিদ্যমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার চরম পতন ডেকে আনতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বের এক বিশাল অংশের জীবনযাত্রা ও চিন্তাজগতকে পরিচালিত করছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনদর্শন। অবশ্য এখানে 'জীবন ব্যবস্থা' ও 'সভ্যতা'—এই দুই ধারণাকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, প্রতীচ্যের বাইরে পৃথিবীর একটি বড় অংশ এখনো আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার কাছে নিজেদের অস্তিত্ব পুরোপুরি সমর্পণ করেনি।

মূল সত্যটি হলো—কেবল বস্তুগত ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যেকোনো ব্যবস্থা বা সভ্যতার আয়ুষ্কাল স্বভাবতই সীমিত। কারণ, পৃথিবীর সম্পদ প্রাচুর্যময় মনে হলেও তা অসীম নয়; একদিন না একদিন তা নিঃশেষ হবেই। সুতরাং, একটি বস্তুভিত্তিক সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার মজুত সম্পদের ওপর। অথচ বাস্তবতা হলো—সম্পদ সাশ্রয় বা ভোগ কমানোর বদলে বিশ্বের সরকারগুলো প্রতি বছর আরও বেশি পরিমাণ সম্পদ উত্তোলনের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ নয়, বরং নিকট ভবিষ্যতেই এটি নিত্যপ্রয়োজনীয় কাঁচামালের এক চরম সংকট তৈরি করতে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ যতই কমতে থাকবে, অবশিষ্ট সম্পদের দখল নেওয়ার লোভ ততই উগ্র হবে; আর সেখান থেকেই শুরু হবে সম্পদের ওপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াই।

আধুনিক সভ্যতার তথাকথিত নীতি মেনেই অবশ্য এই সামরিক হস্তক্ষেপগুলোর অজুহাত তৈরি করা হবে—প্রথমে কৃত্রিম সংকট তৈরি হবে, তারপর গণমাধ্যমে একপেশে প্রচার চালিয়ে কাউকে 'অপরাধী' বা 'খলনায়ক' বানানো হবে, জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় নামকাওয়াস্তে প্রস্তাব পাস হবে; আর শেষপর্যন্ত মঞ্চস্থ হবে আগ্রাসনের মূল নাটক।

আজকের বৈশ্বিক মানচিত্রগুলো কেবল রাজনৈতিক সীমানা নির্দেশ করছে না, বরং সেগুলো রূপ নিচ্ছে 'সম্পদের মানচিত্রে'। রাজনৈতিক মানচিত্রের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব কমে আসছে, কারণ আধুনিক বিশ্বের মূল লড়াই এখন সম্পদ নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

আর এই লুণ্ঠনপ্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য যা হতে পারে, তা হলো আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি—জ্বালানি।

নিশ্চয়ই কেবল তেলই একমাত্র সমস্যা নয়। প্রতিটি বস্তুগত সম্পদেরই একটি সীমা রয়েছে, এবং কোনো প্রাকৃতিক উপাদানই মানুষের সীমাহীন লোভের কাছে চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। তবে বিশ্বজুড়ে প্রথম বড় ধরণের সংঘাত ও সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এই তেল। এর অর্থ এই নয় যে তেলের মজুত একেবারে শেষ হয়ে এসেছে। বর্তমান ব্যবহারের হার বিবেচনা করলেও বহু দশকের তেল এখনো ভূগর্ভে রয়ে গেছে; তাছাড়া রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে বন্ধ রাখা গোপন কূপগুলোতেও রয়েছে বিপুল পরিমাণ তেলের মজুত।

উদাহরণস্বরূপ, কেবল ১৯৯৮ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রায় ১,৩০,০০০ তেলের কূপ বন্ধ ঘোষণা করেছিল। একইভাবে পশ্চিম ইউরোপে নতুন জ্বালানি উৎস আবিষ্কৃত হওয়ার পরপরই কৌশলগত কারণে তা সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। জ্বালানির এই বিশাল প্রাচুর্য সত্ত্বেও আসল সংকট লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়।

সংকটটি হলো—বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ও পণ্যের ব্যবহারের হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই ভোগ কমানো বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রায় অসম্ভব এবং অচিন্তনীয়। যে সরকারগুলোর সুযোগ ছিল জনগণকে কম খরচে ও সাশ্রয়ী হতে আহ্বান জানানোর, তারা নিজেরাই অনিয়ন্ত্রিত 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির' প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের হাত-পা বেঁধে ফেলেছে। পশ্চিমে বার্ষিক ৫-৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক মনে করা হয়, আর প্রাচ্যের দেশগুলো প্রায়ই দুই অঙ্কের (১০%-এর বেশি) প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। ভোট জয়, নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিপুল অর্থায়ন—সবকিছুর জন্যই প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য, আর প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিই হলো জ্বালানি। একদিকে প্রবৃদ্ধির অদম্য ক্ষুধা, অন্যদিকে তেলের ব্যবহার কমানোর তাগিদ—আমরা কি এখানে একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য বা বৈশ্বিক দ্বিচারিতার মুখোমুখি হচ্ছি না?

প্রকৃতি এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই জয় হয়। মানুষের অহংকার সাময়িকভাবে জয়ী মনে হলেও তা অর্জিত হয় বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের বিনিময়ে। প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম এমনই। অথচ আধুনিক মানুষের সমস্ত মনযোগ কেবল সম্পদ বৃদ্ধি, বস্তু উৎপাদন এবং আরও বেশি পণ্যভোগের মধ্যে নিমজ্জিত।

অনিয়ন্ত্রিত লোভই আধুনিক মানুষের আত্মার প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই অনড় মানসিকতা এবং তার ফলে সৃষ্ট প্রবৃদ্ধির উদগ্র বাসনা এক মহাবিপর্যয়ের জন্ম দিচ্ছে।

তাছাড়া, তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট কেবল সাধারণ 'চাহিদা ও যোগানের' সমীকরণ নয়। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে—এটি সাধারণ অর্থনীতি। কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা চাহিদা মেটাতে সরবরাহ সীমাহীনভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ উত্তোলনেরও কারিগরি সীমা রয়েছে। যদি বিপুল পরিমাণ দক্ষ জনবল ও বিনিয়োগ কেবল তেল উত্তোলনের পেছনেই ব্যয় করতে হয়, তবে কৃষি বা মৌলিক শিল্পখাতে কাজ করার মতো সম্পদ ও প্রযুক্তি কোথায় থাকবে? তদুপরি, বিনিয়োগের সিংহভাগ যদি জ্বালানি খাতে চলে যায়, তবে সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য খাতে চরম অর্থসংকট দেখা দেবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবৃদ্ধি এই জ্বালানি কাঠামোর ওপর শতভাগ নির্ভরশীল। ফলে সার্বিক ভোগ কিছুটা কমানো গেলেও

দীর্ঘমেয়াদে চাহিদা বৃদ্ধি ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোভ ও উপযোগবাদই যেহেতু পশ্চিমা সভ্যতার মূল ভিত্তি, তাই সেখানে মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসে নাগরিককে আরও বেশি ভোগসামগ্রী ও সুবিধার নিশ্চয়তা দিয়ে। পণ্যের প্রতি মানুষের এই উদগ্র লালসা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে এই বস্তুভিত্তিক কাঠামোর ভিত্তিই ভেঙে পড়বে।

এছাড়া, জ্বালানি ব্যবহারে লাগাম টানার অর্থ হলো উন্নয়ন কর্মসূচির গতি শ্লথ করে দেওয়া–যার অর্থ আধুনিক মানুষের চোখে তথাকথিত 'মধ্যযুগে' ফিরে যাওয়া। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে গণপরিবহন বা ট্রেন যোগাযোগ বৃদ্ধি করা সহজ, কিন্তু গাড়ি আধুনিক মানুষের সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মানুষ অন্য অনেক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও নিজের গাড়ির অহংকার ত্যাগ করতে রাজি নয়। অন্যদিকে, আধুনিক সভ্যতার 'উপাস্য' তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার বাজেট ছেঁটে ফেলার ঝুঁকি কোনো সরকারই নিতে চাইবে না। ফলে সংকট নিরসনের গাণিতিক সমীকরণটি মিলছে না।

কাজেই, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা তার উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে বা আরও বাড়াতে যেকোনো চরম পদক্ষেপ নেবে। সরকার পতনের ভয়, নাগরিক অসন্তোষ, নৈরাজ্য ও অতীত যুগে ফিরে যাওয়ার আতঙ্ক এড়াতে তারা কিছু নামকাওয়াস্তে সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বস্তুভিত্তিক আধুনিক সভ্যতা একটি একমুখী ট্রেন–এটি কেবল সামনের দিকেই ছুটতে পারে, পেছনে ফেরার উপায় এর নেই।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে জাতীয় অহংকার। লোভী মানসিকতার কেন্দ্রবিন্দু যুক্তরাষ্ট্র কি বিশ্বপরিক্রমায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য ও শীর্ষ স্থান ত্যাগ করতে পারবে? আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সার্বজনীন 'প্রবৃদ্ধি সংকোচন নীতি' কি তারা মেনে নেবে, যেখানে সামান্যতম ঝুঁকি থাকবে যে অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গোপনে তাকে অতিক্রম করে যাবে? এই অবাস্তব প্রত্যাশা করা বৃথা।

অনেক অন্ধ আশাবাদী হয়তো এই সংকটকে হেসেই উড়িয়ে দেবেন এবং বিকল্প শক্তির কথা বলবেন। নিঃসন্দেহে বিকল্প শক্তির নানা উৎস আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু তা কি কোটি কোটি যানবাহন, ভারী শিল্প এবং কৃষিপণ্য পরিবহনের বিশাল বৈশ্বিক চাহিদাকে কম খরচে ও সমান গতিতে মেটাতে সক্ষম?

সুতরাং, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য কাঁচামাল ও সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে। দিগন্তে যখন যুদ্ধের কালো মেঘ জমছে, তখন উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে থাকার সুযোগ নেই। ১৯৯০ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা স্মরণ করলে দেখা যায়, চতুর কৌশল ও কৃত্রিম সংকট তৈরির মাধ্যমে মানবীয় দুর্ভোগকে কীভাবে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ইতোমধ্যেই বিশ্বজুড়ে সামরিক পরাশক্তিগুলো কৌশলগত সম্পদ ও খনিজ অঞ্চলগুলোর আশেপাশে তাদের সামরিক উপস্থিতি জোরদার করেছে। কেউ কেউ ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরিতে ব্যস্ত, যার উদাহরণ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো যৌথ সামরিক-রাজনৈতিক উদ্যোগগুলোকে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনাবলী কি মানবচিন্তার চেয়েও দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে?

ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা হলো–অন্তত সামরিক বিজয়ের দিক থেকে সহিংসতা ও যুদ্ধ অনেক সময় লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু বৈজ্ঞানিক সাফল্য সত্ত্বেও, অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন (Internal Combustion Engine)-এর বিকল্প খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মহাকাশে গিয়ে অন্য গ্রহ থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের অলীক স্বপ্নও আজ ব্যর্থ হতে চলেছে।

বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা উপলব্ধি করছেন যে, মানুষ কখনোই অন্য কোনো গ্রহ বা সৌরজগৎ থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারবে না। মানুষ আদতে

◀ ***পারমাণবিক বোমা হামলার পর জাপানের হিরোশিমা।***

১৯৪৫ সালের ১৭ই নভেম্বর জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলার পরবর্তী দৃশ্য।

এই পৃথিবীর জলবায়ু ও কাঠামোর সাথেই আবদ্ধ। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হওয়ার পর, দূর মহাকাশের উৎসের ওপর ভরসা না করে এই সীমিত গ্রহের সম্পদ ছিনিয়ে নিতেই মানবজাতি নিজেদের মধ্যে আরও নিষ্ঠুর সংঘাত বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে।

আর এই বৈশ্বিক সংঘাত যদি পারমাণবিক রূপ নেয়, তবে তা-ই হবে মানব সভ্যতার শেষ সংঘাত। নীরবে ও দ্রুত গতিতে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক মারণাস্ত্রের বিস্তার ঘটে চলেছে। ইসরায়েল, ভারত ও পাকিস্তানের পর আরও বহু রাষ্ট্র এই সক্ষমতা অর্জনের পথে এগোচ্ছে। আর আধুনিক যুদ্ধের নিষ্ঠুর মূলমন্ত্র হলো: 'হয় শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করো, নয়তো নিজে ধ্বংস হওয়ার আগে সবাইকে নিয়ে ডুবে মরো।'

পারমাণবিক যুদ্ধে কেবল সামরিক ঘাঁটি নয়, শত্রুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বড় শহরগুলো মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। তেজস্ক্রিয়তার মারাত্মক ধোঁয়া ও চেইন রিয়্যাকশন বা ধারাবাহিক ধ্বংসযজ্ঞ পুরো আধুনিক সভ্যতাকে মুহূর্তের মধ্যে গুঁড়িয়ে দেবে এবং মানবজাতিকে এক নিমেষে শিল্প বিপ্লব-পূর্ববর্তী যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এমনকি এই ভয়াবহ যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হলেও, কেবল পরিবেশগত ও সম্পদভিত্তিক সংকটের কারণেই এই সভ্যতার এক ধীর ও শান্তিপূর্ণ পতন ঘটা সম্ভব। ভোগবাদী বস্তুবাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সভ্যতা মানুষের লাগামহীন লালসা ও দুঃসাহসের সামনে স্থায়ী হতে পারে না। সম্পদ নিঃশেষ হওয়া মাত্রই এর অবকাঠামো ধসে পড়বে।

এই পতন কাঁচামাল শতভাগ নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। যখন সম্পদের মজুত উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে, তখন কাঁচামালের দাম আকাশচুম্বী হবে। এর ফলে তৈরি হবে তীব্র বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট (Chain Effect)। চড়া দামের কারণে তেল শোধন বা খনিজ উত্তোলন এতটাই ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে যে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, আর তা বৈশ্বিক শিল্প খাতকে পঙ্গু করে দেবে।

এর সাথে যুক্ত হচ্ছে লাগামহীন অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও বিষাক্ত কার্বন নির্গমনের ফলে জলবায়ু বিপর্যয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া, নতুন অজানা মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং আবহাওয়ার চরম বৈরী আচরণ এই ধ্বংসপ্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দেবে।

বিশ্ব অর্থনীতি যদি ধসে পড়ে, তবে যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো একক পরাশক্তি নিজেদের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখে একা বেঁচে থাকতে পারবে না। বিশ্বের অন্যান্য অংশকে সস্তায় শোষণ করার দিন শেষ হয়ে গেলে, সবচেয়ে বড় ভোগকারী রাষ্ট্রটিই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগীতে পরিণত হবে।

অবশ্য এই ভঙ্গুর সভ্যতার সার্বিক বিপর্যয় নিয়ে আলোচনার আরও অনেক দিক রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি থেকে যায়–বিদ্যমান এই দেউলিয়া ও ধ্বংসমুখী বস্তুবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ কি কোনো বিকল্প দায়িত্বশীল জীবনদর্শনের রূপরেখা তৈরি করতে পেরেছে? নাকি তারা এখনো অন্ধের মতো ধ্বংসের অতল গহ্বরে ছুটে চলা এই ক্ষয়িষ্ণু কাফেলার নিছক বোঝাবাহী অনুসারী হয়েই থাকবে? ■

ভাষাগত বিকৃতি এবং সমাজ গঠনে এর প্রভাব

শিরিন দাগৌরি
দর্শনে স্নাতকোত্তর ও ইসলামিক স্টাডিজে ডিপ্লোমা
সিরিয়া

মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞাময় কিতাবে সর্বপ্রকার 'ফাসাদ' (বিপর্যয় ও দুর্নীতি)-এর বিরুদ্ধে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। অথচ আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এক বিনাশী অনাচারে নিমজ্জিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, আচরণগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক এবং ভাষাগত—সর্বক্ষেত্রেই এক ধরণের অবক্ষয় বিরাজ করছে। এটি মূলত কুরআনের সেই আয়াতেরই বাস্তব প্রতিফলন:

> 'তারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়, আর আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা আল-মায়িদা: ৬৪)

কুরআনে 'ফাসাদ' শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ ও ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

১. **অবাধ্যতা বা পাপ কাজ:** 'আর যখন তাদের বলা হয়, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।' (সূরা আল-বাকারা: ১১)

২. **ধ্বংস বা বিলুপ্তি :** 'যদি আকাশ ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আল-আনবিয়া: ২২)

৩. **জনপদে তাণ্ডব চালানো :** 'নিশ্চয়ই রাজ-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বরবাদ করে দেয়।' (সূরা আন-নামল: ৩৪)

৪. **অনাচার বা সীমালঙ্ঘন :** 'অতএব, তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোতে এমন প্রজ্ঞাবান লোক কেন হলো না, যারা জমিনে অনাচার সৃষ্টিতে বাধা দিত? তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া, যাদের আমরা রক্ষা করেছিলাম।' (সূরা হুদ: ১১৬) এবং

'আর জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না...' (সূরা আল-আরাফ: ৫৬)

'মাফসাদা' (ক্ষতিকর বিষয়) হলো 'মাসলাহা' (কল্যাণ বা জনস্বার্থ)-এর বিপরীত। 'আল-কামুস আল-মুহিত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো বস্তু যখন সুস্থ বা সঠিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয় কিংবা তার রূপান্তর ঘটে বা ধ্বংসের মুখে পড়ে, তখনই তা 'ফাসিদ' বা নষ্ট হিসেবে গণ্য হয়।

ভাষাবিদ আল-রাঘব আল-ইসফাহানি তাঁর 'মুফ্রেদাত আলফাজ আল-কুরআন'-এ উল্লেখ করেছেন, পরিভাষাগতভাবে ফাসাদ হলো কোনো বিষয়ের ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা থেকে সরে যাওয়া। আল-বাইদাবির মতে, 'ফাসাদ হলো ভারসাম্য থেকে কোনো কিছুর বিচ্যুতি।' আবার আল-মুনাভি তাঁর 'আত-তাওকিফ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ফাসাদ হলো কোনো ব্যবস্থার অবকাঠামোগত পতন।'

ইবনুল জাওজি উল্লেখ করেন, ফাসাদ হলো কোনো বস্তুর সুস্থ অবস্থার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। বাক্য বা বক্তব্যকে 'ফাসিদ' বলা হয় যদি তা বিশৃঙ্খল ও অর্থহীন হয়; আর কর্মকে 'ফাসিদ' বলা হয় যদি তা উদ্দেশ্যহীন ও মূল্যহীন হয়।

মানুষ যখন নিজ প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশির (আহওয়া) অনুসরণ শুরু করে, তখন সমাজে নানা বিভ্রান্তিকর মতবাদের জন্ম হয়–যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও অস্তিত্ববাদ। এই মতবাদগুলো নিজেদের মানবমুক্তির রূপরেখা হিসেবে উপস্থাপন করলেও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিচয়কে উপেক্ষা করে চাপিয়ে দেওয়া এসব চিন্তা সমাজে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয় তৈরি করেছে।

সিরীয় শাসনব্যবস্থা এর একটি বাস্তব উদাহরণ, যেখানে 'ঐক্য, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র'-এর সুদৃশ্য স্লোগানের অন্তরালে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি লালন করা হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম, অর্থনীতি থেকে শুরু করে নৈতিকতা–সর্বত্র এই অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছিল:

'আর যখন তাদের বলা হয়, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুধাবন করে না।' (সূরা আল-বাকারা: ১১-১২)

দুর্নীতি হলো জাতিসমূহের পতন ও সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলের উদাহরণ দিয়ে সতর্ক করেছেন যে, অনাচার ও ঔদ্ধত্যই চূড়ান্ত বিনাশ ডেকে আনে (সূরা আল-ইসরা: ৪-৫)। পক্ষান্তরে, কেবল সৎ ও নীতিবান জাতিই বিজয়ী হিসেবে টিকে থাকে (সূরা আল-আনবিয়া: ১০৫)।

ভাষার অবক্ষয় এবং সভ্যতার পতন

যাবতীয় সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে ভাষাগত বিকৃতি। ভাষাগত ফাসাদই প্রথমে মানবজাতিকে কুরআনের সুসংহত ভাবধারা ও সঠিক বোঝাপড়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়–যে কিতাবে রয়েছে বিশ্বজনীন সত্যের মূল ভিত্তি।

ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি চিন্তার আধার এবং সমাজের আয়না। আল-জাহিজ তাঁর 'আল-বয়ান ওয়া আত-তাবিইন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের বক্তব্যের মান তার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানকে প্রকাশ করে। যদি কোনো জাতি তার ভাষা ও পরিভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার বাহ্যিক কাঠামোও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

'সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে, আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেনে রাখো, সেটি হলো কালব (হৃদয়)।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

একটি অসুস্থ হৃদয় যেমন পুরো শরীরকে অচল করে দেয়, তেমনি ভাষার অবক্ষয় পুরো জাতির চিন্তা, নৈতিকতা ও সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেয়। ইবনু খালদুন তাঁর 'আল-মুকাদ্দিমা'-য় উল্লেখ করেছেন, বিজিত বা অবক্ষয়গ্রস্ত জাতি যখন অন্যের সংমিশ্রণে এসে নিজ ভাষার মৌলিকত্ব হারায়, তখন শব্দের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ বিকৃত হতে শুরু করে।

মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক পতনও শুরু হয়েছিল তখন, যখন তারা নিজস্ব পরিভাষা ত্যাগ করে বিদেশি ও উপনিবেশবাদী রাজনৈতিক পরিভাষা গ্রহণ করে। আল-রাফিঈর ভাষায়, ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী এমন কিছু বিভ্রান্তিকর শব্দ প্রয়োগ করে যা আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের ইঙ্গিত দিলেও বাস্তবে প্রতিরোধকে দুর্বল করার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) যথার্থই বলেছেন:

'আরবি ভাষা চর্চা মানুষের বুদ্ধি, চরিত্র ও দ্বীনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এটি জানা ওয়াজিব; কারণ কিতাব ও সুন্নাহ বোঝা ফরজ, আর আরবি ভাষার জ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়।'

পরিভাষার অপব্যবহার ও শব্দার্থের বিপর্যয়

আমাদের যুগে ভাষা ও বাস্তবতার মধ্যকার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে। ফাঁকা বুলি ও অতিরঞ্জনের আড়ালে সত্যকে

ঢাকা হচ্ছে। আল-রাফিঈ তাঁর 'ওয়াহিউল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন:

'যে জাতি গৌরব করার মতো কোনো মহান কর্ম খুঁজে পায় না, সে নিজেকে বিভ্রান্ত করার জন্য বড় বড় শব্দ আবিষ্কার করে।'

রাজনীতি ও সংবাদমাধ্যমে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ উল্টে দেওয়া হয়েছে:

- মুসালাহা (আপস): স্বৈরাচারী শাসনের সামনে শর্তহীন আত্মসমর্পণকে আড়াল করতে এই পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।
- হুদনা (যুদ্ধবিরতি): একটি পক্ষকে কোণঠাসা করে অন্য পক্ষকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেওয়ার কৌশলে পরিণত হয়েছে।
- সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ: সিলেক্টিভ বা পক্ষপাতমূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার হলেও শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে এখানে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

ইবনু খালদুনের মতে, বাক্যের আসল সত্তা নিহিত থাকে তার সঠিক অর্থ প্রকাশের মধ্যে; অর্থ হারিয়ে গেলে ভাষা একটি প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয়।

ডিজিটাল মাধ্যম ও ভাষাগত সংকট

বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে বিদেশি ভাষাগত কাঠামোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফ্রাঙ্কো-অ্যারাবিক (লাতিন হরফে আরবি), আঞ্চলিক কথ্য উপভাষার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং শব্দার্থের বিভ্রান্তি যুবসমাজকে মূল ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করছে।

অনেকে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান ছাড়াই তাফসীর ও তাদাব্বুরের পার্থক্য গুলিয়ে ফেলছেন। ইবনু তাইমিয়াহর ভাষায়, 'অর্ধ-জ্ঞানী' মানুষরা সমাজ ও ধর্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়:

'মানুষ ধ্বংস হয় এদের কারণে: অর্ধ-ধর্মতাত্ত্বিক যে ধর্মকে ধ্বংস করে, অর্ধ-আইনবিদ যে দেশ ধ্বংস করে, অর্ধ-ব্যাকরণবিদ যে ভাষা ধ্বংস করে, আর অর্ধ-চিকিৎসক যে মানুষের জীবন ধ্বংস করে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ অশালীন পরিভাষা ও অন্তঃসারশূন্য প্রদর্শনী বেড়ে গেছে। দুঃখজনক ট্র্যাজেডি বা গণহত্যার বিবরণ সংবলিত নিবন্ধের সাথে হাসিমুখের ফিল্টার করা ছবি প্রকাশ করা আজ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে–যা বিষয়টির গাম্ভীর্যকে নষ্ট করে দেয়।

সামাজিক ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের একমাত্র পথ

ভাষার ব্যাকরণ, রূপতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্রের পতন একটি সভ্যতার চূড়ান্ত পতনকে সূচিত করে। আন্দালুসের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইবনু খালদুন দেখিয়েছেন, কীভাবে ভাষার দক্ষতার অবক্ষয় একটি গোটা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল।

একটি জাতি তার সম্মান ও ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাষা ও পরিভাষার সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনে। শব্দ ও পরিভাষা থেকে হারানো অর্থ উদ্ধার করা এবং সেগুলোকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করাই হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ। ■

কুরআন হাফেজের সংখ্যা বাড়ছে
কিন্তু হেদায়েত অনুযায়ী আমলের চর্চা কি কমছে?

আসমা মুফিদ কামিল
লেখক ও অনুবাদক, এ হাবের টিভি
সিরিয়া

ইসলামি উম্মাহর ইতিহাসে কুরআন হিফজ বা মুখস্থ করার এত সহজলভ্য সুযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ বিপুলসংখ্যক শিশু-কিশোর ও তরুণ পরম আগ্রহে কুরআন মুখস্থ করছে। কিন্তু এই ইতিবাচক চিত্রেও একটি গভীর প্রশ্ন সামনে আসে–হাফেজদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়লেও ব্যক্তিগত চরিত্র, সামাজিক নৈতিকতা ও সামগ্রিক জীবনযাত্রায় কুরআনের শিক্ষার প্রতিফলন কি একই হারে ঘটছে?

মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কুরআনুল কারিমের শাশ্বত শিক্ষার দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তবে এই জন্য কেবল তিলাওয়াত ও

হিফজই যথেষ্ট নয়; বরং প্রতিটি আয়াতের অর্থ অনুধাবন, গভীর চিন্তাভাবনা (তাদাব্বুর) এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি–যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা সোয়াদ: ২৯)

সালফে সালেহিনের (পূর্বসূরি সৎকর্মশীল মনীষী) জীবনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেও কুরআন শিক্ষার এই ভারসাম্যপূর্ণ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অনুধাবন ও আমলের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, কুরআনের প্রকৃত অনুসারী কেবল সে-ই নয় যে তা মুখস্থ রাখে; বরং সে-ই, যে এর শিক্ষা জানে, বোঝে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।

তিনি এমন এক ব্যক্তির রূপক উদাহরণ দিয়েছেন, যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটি তীর তৈরি করল, কিন্তু শিকার বা যুদ্ধের ময়দানে তা ব্যবহার করল না। অর্থাৎ কুরআন মুখস্থ করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করা তার চেয়েও বেশি অপরিহার্য। কেবল মুখস্থের চেয়ে অনুধাবন ও আমলের গুরুত্ব বহুগুণ বেশি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআন শিক্ষার পদ্ধতিতেও এই নীতিরই প্রতিফলন দেখা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে একসঙ্গে ১০টি আয়াত শিখতেন। সেই আয়াতগুলোর অর্থ অনুধাবন ও তা অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত তাঁরা পরবর্তী আয়াতে অগ্রসর হতেন না। ফলে তাঁদের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও আমল পাশাপাশি ধাবিত হতো। সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবল কতটুকু কুরআন মুখস্থ ছিল তা দিয়ে নির্ধারিত হয়নি; বরং কুরআন তাঁদের চরিত্র, মানসিকতা ও আচরণে কতটা রূপান্তর এনেছিল–সেটিই ছিল মূল বিষয়।

বর্তমান সময়ে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই এমন এক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, যেখানে সাফল্য পরিমাপ করা হয় কত পারা বা কতটি সূরা মুখস্থ হলো তা দিয়ে। অথচ সংরক্ষিত এই আয়াতগুলো মানুষের আখলাক, নৈতিকতা ও দৈনন্দিন সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলছে–সে বিষয়ে তুলনামূলক কম মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

জীবনের তীব্র ব্যস্ততা, অতিরিক্ত স্ক্রিন ও প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং তাফসীর কেন্দ্রিক আলোচনার ঘাটতির কারণে অনেকের সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ক কেবল তিলাওয়াত ও হিফজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। অথচ কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য কেবল পঠন নয়; বরং হেদায়েত গ্রহণ, তাদাব্বুর এবং সেই হেদায়েতের আলোকে জীবন পুনর্গঠন করা।

কুরআন কি মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে?

অবশ্যই পারে। কুরআন মানুষের অন্তর, বিবেক ও

বুদ্ধিবৃত্তিকে ঐশ্বরিক আলোয় আলোকিত করার অসীম ক্ষমতা রাখে। মানুষ যখন নিজের অস্তিত্বের রহস্য, জীবনের আসল উদ্দেশ্য, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধান করে, তখন কুরআনই হয়ে ওঠে তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশক।

একজন মুমিন যখন আল্লাহর প্রতি নিজের দাসত্ব ও অনুগত থাকার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, তখন কুরআনের সঙ্গে তার সম্পর্কও এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। কুরআন তখন কেবল পাঠের বিষয় থাকে না; বরং দৈনন্দিন চিন্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত, মার্জিত আচরণ ও আত্মশুদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

কুরআনের সঙ্গে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুদ্ধ তিলাওয়াতের পাশাপাশি নিয়মিত অর্থ ও তাফসীর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। নির্ভরযোগ্য আলেম ও তাফসীরবিদদের কাছ থেকে শব্দার্থ ও আয়াতের পটভূমি জানা থাকলে এর গভীর অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়। এছাড়া মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা, তাফসীরের মজলিসে সম্পৃক্ত হওয়া এবং নিয়মিত আত্মপর্যালোচনার (মুহাসাবা) অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের পর কয়েক মিনিট থেমে নিজেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে–

- 'আজকের পঠিত আয়াতগুলো আমাকে কী বার্তা দিল?'
- 'কোনো ভুল আচরণ সংশোধনের ইঙ্গিত কি এতে রয়েছে?'

- ‘আমার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের কোন ক্ষেত্রে এই নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন করা জরুরি?’

এমন নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা কুরআন পাঠকে কেবল একটি দৈনন্দিন নিয়মরক্ষায় আটকে না রেখে আত্মশুদ্ধির এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করে।

হিফজের প্রকৃত সাফল্য কোথায়?

আল্লাহর কালাম অন্তরে ধারণ করা নিঃসন্দেহে এক মহা সৌভাগ্য ও নিয়ামত। কুরআনের হাফেজগণ সালাত, তাহাজ্জুদ ও ব্যক্তিগত ইবাদতে অনায়াসে তা তিলাওয়াত করতে পারেন। জীবনের কঠিন সংকট, মানসিক যন্ত্রণা বা শোকের মুহূর্তে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ একজন মুমিনকে যোগায় অদম্য ধৈর্য, সান্ত্বনা ও সঠিক পথের দিশা।

তবে হিফজের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা তখনই ফুটে ওঠে, যখন স্মৃতিতে রক্ষিত আয়াতগুলো মানুষের ব্যবহারিক আচরণের আলো হয়ে ওঠে। কোনো কঠিন সংকটে কিংবা প্রলোভনে পড়ে যদি কুরআনের শিক্ষা স্মরণে এনে একজন মানুষ অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখেন, ক্রোধের মুহূর্তে সংযত হন, মানুষের হক রক্ষা করেন কিংবা আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেন–তখনই তাঁর হিফজ লাভ করে এক জীবন্ত তাৎপর্য।

দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের প্রয়োগ

কুরআন কেবল আধ্যাত্মিক চর্চার কিতাব নয়; এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা, ব্যবসায়িক সততা, লেনদেন, ঋণ পরিশোধ, উত্তরাধিকার বণ্টন, পারিবারিক সম্পর্কের ভারসাম্য, বিবাহ, জাকাত ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশীর অধিকার, সন্তান প্রতিপালন এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ–প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

তাই কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ককে কেবল মসজিদ, মাদ্রাসা কিংবা নির্দিষ্ট তিলাওয়াতের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। পারিবারিক মতভেদের সময়, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে, সন্তানকে শাসনের ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় কুরআনের শিক্ষাকে মানদণ্ড হিসেবে সামনে রাখা প্রয়োজন।

কুরআন শেখা ও বোঝার পাশাপাশি এর বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব। এর জন্য বড় কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই। পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন বসে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ পড়া, অর্থ বোঝা এবং তা কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়–তা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

কুরআনকেন্দ্রিক এই পাঠচক্রগুলো মানুষের মাঝে এমন এক রুহানি বন্ধন তৈরি করে, যা পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক ভালোবাসা ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমান উম্মাহর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো–কুরআন আমাদের অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতা ও প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকলেও দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে। আমরা মসজিদে সাগ্রহে কুরআন শুনি, হালাকায় তা হিফজ করি, ঘরে পরম সম্মানে উঁচুতে সাজিয়ে রাখি; অথচ ঝগড়া-বিবাদ, আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তান প্রতিপালন কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর শিক্ষা বেমালুম ভুলে যাই।

অথচ কুরআন চায় না একজন মুসলিম কেবল দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময় তার সঙ্গে কাটাবে; বরং কুরআন চায় এর শাশ্বত শিক্ষা যেন মানুষের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং কথা, কাজ ও সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত মানদণ্ডে রূপ নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনুল কারিমের শিক্ষা মানুষের আত্মাকে পরিশোধিত করে, হৃদয়কে প্রশান্ত করে এবং পরম সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। তবে কেবল হাফেজের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ালেই উম্মাহর বাস্তব জীবনে কুরআনের প্রকৃত প্রভাব ফিরে আসবে না। প্রয়োজন এমন এক স্বর্ণালী প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা কুরআন হিফজ করার পাশাপাশি এর তাদাব্বুর বা গভীর অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে, তিলাওয়াতের পাশাপাশি আমলে মনোযোগী হবে এবং নিজেদের চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও সিদ্ধান্তের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে কুরআনকে গ্রহণ করবে।

তখনই কুরআন কেবল স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোনো গ্রন্থ হয়ে থাকবে না; বরং বিশ্বজুড়ে মানবজীবনের হেদায়েতের এক জীবন্ত ও সক্রিয় বিধান হিসেবে পুনপ্রতিষ্ঠিত হবে। ■

সিরিয়ার পুনর্গঠন

স্প্যানিশ আলোকচিত্রীর চোখে মানুষের জীবনসংগ্রাম

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

স্প্যানিশ আলোকচিত্রী দিয়েগো ইবারা সানচেজের (Diego Ibarra Sanchez) কাছে আলোকচিত্রের কাজ কেবল শাটার টেপার মধ্য দিয়ে শুরু হয় না; এর সূচনা ঘটে বহু আগে। তাঁর চোখে একটি সার্থক ছবি হলো দীর্ঘ গবেষণা, আত্মোপলব্ধি, সাক্ষাৎকার এবং গল্পের চরিত্রগুলোর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার দীর্ঘ যাত্রার ফল। সিরিয়া নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক কাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি কেবল যুদ্ধের ক্ষত ও ধ্বংসলীলা ফ্রেমে বন্দি করেই থেমে থাকেননি; বরং সংঘাত-পরবর্তী সমাজের রূপান্তর এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও দেশ পুনর্গঠনে সিরীয়দের অদম্য সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন।

সিরিয়া ও আফগানিস্তানভিত্তিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সানচেজ ২০২৬ সালের 'ইস্তাম্বুল ফটো অ্যাওয়ার্ডসে' তিনটি পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর বিজয়ী কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'সিরিয়ার পুনর্গঠন' (Reconstructing Syria) শীর্ষক আলোকচিত্র সিরিজটি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর সিরীয় সমাজের বর্তমান বাস্তবতার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব ও আগ্রহেরই প্রতিফলন এই কাজ।

যুদ্ধোত্তর সিরিয়া: গোলাগুলি থামার পর কী ঘটে?

'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর অ্যাসাইনমেন্টে সানচেজ লাতাকিয়া, ইদলিব, আলেপ্পো এবং দামেস্কসহ সিরিয়ার বেশ কয়েকটি শহরের দৈনন্দিন জীবন ক্যামেরাবন্দি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ বা সামরিক অভিযানের বীভৎসতা নথিভুক্ত করা ছিল না; বরং তাঁর নজর ছিল সংঘাত-পরবর্তী মূল প্রশ্নগুলোর দিকে : মানুষ কীভাবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরে? একটি সমাজ কীভাবে নিজের পায়ে ঘুরে দাঁড়ায়? আর যুদ্ধক্লান্ত একটি দেশ কীভাবে তার পারস্পরিক সম্পর্ক, স্মৃতি ও স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধার করে?

এই ভাবনাই তাঁকে সিরীয়দের দৈনন্দিন জীবনের এমন সব সূক্ষ্ম ও সাধারণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করে, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও যুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সানচেজের মতে, 'পুনর্গঠন' মানে কেবল দালানকোঠা বা অবকাঠামো মেরামত নয়; এর প্রকৃত অর্থ

হলো সামাজিক বন্ধন জোড়া লাগানো, পারস্পরিক আস্থা ও নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করা। ফলে সানচেজের ফ্রেমে সিরিয়া কেবল যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ নয়, বরং ভবিষ্যতের পথ খোঁজা এক ঘুরে দাঁড়ানো সমাজ হিসেবে উঠে এসেছে।

ধ্বংসস্তূপের মাঝে দৈনন্দিন জীবন

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে কেবল ধ্বংসলীলা ও ভুক্তভোগীদের গণ্ডিতে বন্দি রাখার প্রথাগত ধারা থেকে সরে এসেছেন সানচেজ। হাজারো বাধা সত্ত্বেও মানুষ যখন দৈনন্দিন রুটিনে ফিরতে লড়াই করে, তখন জীবনের যে নতুন দৃশ্যপট তৈরি হয়–তিনি সেটিই দেখাতে চেয়েছেন।

এ ধরনের আলোকচিত্রের মূল গুরুত্ব হলো–তা আমাদের মনোযোগকে যুদ্ধের মুহূর্ত থেকে সরিয়ে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের দিকে নিয়ে যায়। গোলাগুলি থামলেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় না; এর রেশ মানুষের মন, সম্পর্ক ও স্মৃতির গভীরে দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

ছবিগুলোর মাধ্যমে এই আলোকচিত্রী এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যা চিরাচরিত যুদ্ধ-সাংবাদিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়: যুদ্ধ থামার পর সমাজে কী ঘটে? মানুষ কীভাবে এসব ক্ষত বয়ে নিয়ে বাঁচে? আর এত সহিংসতা ও ধ্বংসের পর তারা কীভাবে তাদের জীবন ও স্মৃতি নতুন করে সাজায়?

সমাজের পুনর্গঠন

সানচেজের 'সিরিয়ার পুনর্গঠন' প্রকল্পটি মূলত সংঘাতের পর জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার সামাজিক সক্ষমতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা। সহিংসতার ছবি তুলে একপেশেভাবে যুদ্ধের গল্প শোনানোর পরিবর্তে তিনি এর পরের অধ্যায়টি নথিভুক্ত করতে চেয়েছেন। এখানে সিরীয়রা কেবল করুণার পাত্র নন; বরং প্রতিকূলতার মুখেও নিজেদের জীবন নতুন করে সাজাতে এবং সামাজিক সম্পর্কের সেতু তৈরিতে সক্রিয় এক জাতি।

এই দর্শনে এসে ক্যামেরা কেবল দৃশ্য ধারণের যন্ত্র থাকে না, বরং সামাজিক পরিবর্তনের দলিল হয়ে ওঠে। সানচেজ জোর দিয়ে বলেন যে, সিরিয়ার এই পর্যায়টি তাঁকে সবচেয়ে বেশি

টেনেছে—অথচ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই দিকটি যুদ্ধের খবরের চেয়ে অনেক কম মনোযোগ পায়। বিশ্ব যখন লড়াই, বোমাবর্ষণ ও ধ্বংসের খবরে মত্ত, তখন সাধারণ মানুষের এই নীরব জীবনসংগ্রামও নথিভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।

লড়াই থামা মানেই সংঘাতের অবসান নয়

সানচেজের কাজের মূল ভিত্তি হলো এই উপলব্ধি—সক্রিয় লড়াই বন্ধ হওয়া মানেই সংঘাতের চূড়ান্ত অবসান নয়। মানসিক আঘাত, প্রিয়জন হারানোর বেদনা, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বসতভিটা এবং চুরমার হয়ে যাওয়া সামাজিক কাঠামোর ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয় বহু দশক ধরে।

সানচেজের মতে, আলোকচিত্রে এমন গভীরতা আনা কেবল ক্যামেরা হাতে কোনো স্থানে পৌঁছে যাওয়ার বিষয় নয়। শাটার বোতাম টেপার অনেক আগেই শুরু হয় আসল কাজ–গবেষণা, স্থান ও কাল অনুধাবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার সাথে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে।

তাই তিনি মনে করেন, অস্ত্র শান্ত হলেই আলোকচিত্রীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং সেখান থেকেই প্রামাণ্য আলোকচিত্রের (Documentary Photography) এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে একটাই প্রশ্ন–মানুষ কীভাবে এই ধ্বংসস্তূপকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচে?

প্রথম নজরে যেসব ছবিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরের বা সাধারণ মনে হয়, সেগুলোর ভেতরেও লুকিয়ে থাকে সংঘাতের গভীর ছাপ। সানচেজের বিশ্বাস, এই মুহূর্তগুলো ধরে রাখা যুদ্ধ ও তার পরবর্তী বাস্তবতার একটি দৃশ্যমান স্মৃতি তৈরি করতে সাহায্য করে–যে স্মৃতি কেবল মৃত্যু ও ধ্বংসের নয়, বরং সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে টিকে থাকা জীবনেরও।

বেদনা ও আশার মেলবন্ধন

সানচেজ মনে করেন, সিরিয়া ও তার মানুষের বিপুল দুর্ভোগকে একক কোনো ফ্রেমে ধরা সম্ভব নয়। তাই তিনি বেদনা ও আশা এবং অতীতের ক্ষত ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

এ কারণেই তিনি এমন ছবিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন, যেখানে মানুষকে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লড়াই করতে দেখা যায়। এটি দর্শকদের সংঘাতের আগুনে পোড়া সমাজের স্থিতিস্থাপক (Resilient) রূপটি দেখার সুযোগ করে দেয়। এর অর্থ ট্র্যাজেডিকে ছোট করে দেখা বা ধ্বংসকে উপেক্ষা করা নয়; বরং ঘটনার ক্যানভাসকে আরও বড় করা, যাতে 'যুদ্ধ'ই কোনো সমাজের একমাত্র পরিচয় হয়ে না ওঠে।

নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে আলোকচিত্র

সানচেজ তাঁর কাজকে একটি মৌলিক নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন: একজন আলোকচিত্রী কীভাবে অন্যের দুর্ভোগকে ফ্রেমের ভেতরের নিছক 'বিষয়বস্তু' বা 'অবজেক্ট' না বানিয়ে তা নথিভুক্ত করতে পারেন?

তিনি স্পষ্ট জানান, আলোকচিত্রের পাত্র-পাত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এই কাজের পূর্বশর্ত। আলোকচিত্রীরা রক্তমাংসের মানুষ ও তাঁদের প্রত্যক্ষ দুর্দশা নিয়ে কাজ করেন; ফলে ফ্রেমের ভেতরে যেন তাঁদের মানবিক মর্যাদা কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। যখন হতাহত বা বাস্তুচ্যুত মানুষকে কেবল সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়, তখন ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায়। আলোকচিত্রের শক্তি এখানেই–তা মানুষকে পরিসংখ্যানের খাতা থেকে বের করে আবার গল্পের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে।

কেন ছবি তোলার আগেই প্রকল্পের সূচনা?

সানচেজের মতে, আলোকচিত্রে এমন গভীরতা আনা কেবল ক্যামেরা হাতে কোনো স্থানে পৌঁছে যাওয়ার বিষয় নয়। শাটার বোতাম টেপার অনেক আগেই শুরু হয় আসল কাজ–গবেষণা, স্থান ও কাল অনুধাবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার সাথে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে।

সংঘাতের চটজলদি কিছু ছবি তুলে বিদায় নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি চেয়েছেন সমাজটিকে গভীরভাবে বুঝতে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে। সত্যিকারের প্রামাণ্য কাজের জন্য সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন, কারণ মানুষের আস্থা অর্জন এবং তাঁদের ভেতরের গল্প অনুধাবন করা এক মুহূর্তে সম্ভব নয়।

সিরিয়া: এক অশেষ গল্প

সিরিয়ায় সানচেজের অভিজ্ঞতা আলোকচিত্র সাংবাদিকতার (Photojournalism) এক অন্য রূপ প্রকাশ করে: বোমাবর্ষণের মাধ্যমে গল্পের শুরু হয় না, আবার তা থেমে যাওয়ার সাথে সাথে গল্প শেষও হয়ে যায় না। এই দুই প্রান্তের মাঝে ও বাইরে রয়েছে মানুষের সম্পূর্ণ একটি জীবন।

লাতাকিয়া থেকে আলেপ্পো কিংবা দামেস্কে তিনি কেবল ধ্বংসস্তূপ খোঁজেননি, খুঁজেছেন সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টিকে থাকা মানুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা রঙ এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের প্রয়াস। তাঁর লেন্সে সিরিয়া কেবল যুদ্ধাক্রান্ত কোনো ভূখণ্ড নয়, বরং এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমাজ–যা সংঘাতের ক্ষত নিয়ে প্রতিদিন সামনের দিকে এগোনোর পথ খুঁজছে।

পরিবেশিত 'সিরিয়ার পুনর্গঠন' কেবল ইট-পাথরের ইমারত গড়ার গল্প নয়, এটি মানুষের নিজেদের নতুন করে গড়ে তোলার আখ্যান। সানচেজের কাছে এই গল্প একক কোনো ফ্রেমে বন্দি করার নয়–ক্যামেরার শাটার টেপার বহুকাল আগেই যার শুরু, আর যার প্রভাব অস্ত্র শান্ত হওয়ার অনেক পর পর্যন্ত বহমান থাকে। ■

বাংলাদেশের কওমী মাদরাসা
সার্বিক চিত্র ও উন্নয়নে করণীয়

মাওলানা লিয়াকত আলী
বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও সিনিয়র সাংবাদিক

কওমী মাদরাসা হলো ইসলামী শিক্ষার নির্ভেজাল ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। মুসলিম জাতির দীনি শিক্ষার চাহিদা পূরণে সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সহায়তায় এগুলো পরিচালিত হয় বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কওমী' (জনগণের) মাদরাসা। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হলেও বর্তমানে পুরো মুসলিম বিশ্বসহ অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও মুসলমানরা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সরকারি অনুদান ব্যতিরেকে, সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় এবং আমজনতার সক্রিয় তত্ত্বাবধান ও আনুকূল্য থাকায় এগুলো জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই কওমী মাদরাসা হলো জাতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক এবং খাঁটি দীনি শিক্ষা ও দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র। মুসলিম উম্মাহর আস্থা, আন্তরিকতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি।

শিক্ষা হলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মহান আল্লাহর নাজিলকৃত প্রথম ওহিতে মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কলমের সাহায্যে অজানা বিষয় শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছিল। এমনকি মহানবী (সা.) নিজেও নিজের পরিচয় দিয়েছেন একজন 'মুয়াল্লিম' বা শিক্ষক হিসেবে।

ফলে ইসলামের কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মদিনা থেকে যেমন ইসলামের প্রসার ঘটেছে, তেমনই সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার

আলো। মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, মিশর, দামেস্ক, বাগদাদ ও স্পেন কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না; বরং তা ছিল বিশ্বমানের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। তৎকালীন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিশাল অংশ যখন মুসলিম শাসনের অধীনে, তখন এসব কেন্দ্র থেকেই বিশ্বময় জ্ঞানের আলো বিকশিত হয়েছিল। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ইউরোপকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন মুসলিম মনীষীরাই। স্পেনের শিক্ষালয়গুলোতে তখন জ্ঞানার্জনের জন্য ইউরোপীয়দের ঢল নামত।

ইসলামী জ্ঞানের এ বিস্তার ঘটেছিল মূলত বিজয়ের ধারাবাহিকতায়। ভারতীয় উপমহাদেশে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের আমলে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মাধ্যমে অভিযান শুরু হলেও এবং সুলতান মাহমুদ গজনভির একাধিক অভিযানের পর, স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতান শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর হাতে। প্রায় সাতশত বছর মুসলমানরা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষ শাসন করেন। এ সময়েই মদিনা, কুফা ও বসরার পথ ধরে মধ্য এশিয়া হয়ে জ্ঞানচর্চার এ ধারা দিল্লিতে পৌঁছায়। মুঘল শাসনামলে সমগ্র উপমহাদেশজুড়ে অজস্র দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক শাসক ও ভূস্বামীরা এসব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করাকে পরম গৌরবের মনে করতেন। বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি 'ওয়াকফ' করে মাদরাসাগুলোর আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা ছিল তৎকালীন সাধারণ নিয়ম। এসব লাখেরাজ (করমুক্ত) সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করেই মাদরাসা শিক্ষা পরিচালিত হতো।

তবে ইউরোপীয় বণিকশ্রেণি ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রাজ্য ক্ষমতা দখল করে নেয়। ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে ইংরেজদের যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটে, তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মাদরাসার আলেম ও শিক্ষার্থীরাই। কারণ তৎকালীন সমাজে 'শিক্ষিত' বলতে মাদরাসাপড়ুয়াদেরই বোঝানো হতো। বলা চলে, ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত বিদেশি দখলদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেমসমাজই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

পটভূমি

১৮৫৭ সালে সর্বভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে ওঠে, যা ইংরেজরা চতুরতার সঙ্গে 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে। ছলে-বলে-কৌশলে এবং ক্ষমতার দাপটে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ আন্দোলন দমন করে। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ কেন্দ্র দিল্লিও হাতছাড়া হয়ে যায়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ও অংশ নেওয়ার অপরাধে হাজার হাজার আলেমকে শহীদ করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় হাজারও মাদরাসা এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় ওয়াকফকৃত লাখেরাজ সম্পত্তি। মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার ধারক-বাহকদের নিশ্চিহ্ন করা এবং ভবিষ্যতে যেন দীনি শিক্ষার ধারা পুনরুজ্জীবিত হতে না পারে, সেই পথ রুদ্ধ করা।

তবে চরম সংকটেও মুসলিম মনীষীরা হতাশ হননি। রাজত্ব হারালেও যেন ঈমান-আকিদা হারাতে না হয়, সেজন্য তাঁরা এক বিকল্প পথ উদ্ভাবন করেন। দিল্লি থেকে নিরাপদ দূরত্বে দেওবন্দ ও সাহারানপুরে সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয় নতুন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা সরকারি অনুদান ছাড়া, সম্পূর্ণ 'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ' (আল্লাহর ওপর ভরসা) এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার এ নতুন যাত্রা শুরু হয়। এই বিপ্লবই ইতিহাসে 'কওমী মাদরাসা' আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করে।

১৮৬৬ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং প্রায় একই সময়ে মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর প্রতিষ্ঠার পর, সেখান থেকে শিক্ষিত আলেমরা উপমহাদেশজুড়ে একই আদর্শে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদরাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

- দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) : ১৯০১ খ্রি.
- গাছবাড়ী মাদরাসা (সিলেট) : ১৯০১ খ্রি.
- বংশাল মাদরাসা (ঢাকা) : ১৯০৮ খ্রি.
- জিরি মাদরাসা (চট্টগ্রাম): ১৯১১ খ্রি.
- তাতীবাজার মাদরাসা (ঢাকা) : ১৯১৩ খ্রি.
- জামেয়া ইউনুছিয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : ১৯১৪ খ্রি.
- গওহরডাঙ্গা মাদরাসা (গোপালগঞ্জ) : ১৯৩৬ খ্রি.
- বড়কাটারা মাদরাসা (ঢাকা) : ১৯৩৬ খ্রি.
- পটিয়া মাদরাসা (চট্টগ্রাম) : ১৯৩৭ খ্রি.
- চারিয়া মাদরাসা (চট্টগ্রাম) : ১৯৪৩ খ্রি.
- জামিয়া ইমদাদিয়া (কিশোরগঞ্জ) : ১৯৪৫ খ্রি.
- লালবাগ মাদরাসা (ঢাকা) : ১৯৫৩ খ্রি.

বর্তমানে বাংলাদেশে হাজার হাজার ছোট-বড় কওমী মাদরাসা সক্রিয় রয়েছে। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম শিশুদের ইসলামের আদর্শে গড়ে তোলার পাশাপাশি সৎ, দায়িত্বশীল ও নীতিবান নাগরিক তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। সরকারি স্বীকৃতি বা অনুদান না থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের আস্থা কওমী মাদরাসার সবচেয়ে বড় শক্তি। সমাজে নীতিবান, আপসহীন ও নির্ভেজাল চরিত্রের মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে এই ধারার অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

কওমী মাদরাসার বিদ্যমান চিত্র

পাঠ্যক্রম ও নেসাব : কওমী মাদরাসাগুলোতে মূলত 'দরসে নেজামী' পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। মোল্লা নেজামুদ্দিন সাহালবী (র.) যখন এ সিলেবাস প্রণয়ন করেন, তখন তা সময়ের সব চাহিদা পূরণে সক্ষম ও সর্বাধুনিক ছিল। তাফসির, হাদিস ও ফিকহের মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি এতে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও ভূগোলের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে আরবি ব্যাকরণ (নাহু-সরফ) ও অলংকারশাস্ত্রের (বালাগাত) গভীর চর্চা যুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফল নেতৃত্ব দিতে পারতেন। ফলে দরসে নেজামীর গ্র্যাজুয়েটেরা প্রশাসনিক দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গবেষণা ও সামরিক ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিলেন।

বর্তমান সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ : সময়ের ব্যবধানে এই সমকালীন প্রাসঙ্গিকতায় ঘাটতি তৈরি হয়েছে। দীনের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা যথারীতি বজায় থাকলেও আধুনিক বিশ্বের উপযোগী আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীতে পিছিয়ে পড়ার চিত্র স্পষ্ট :

যুগের সাথে দূরত্ব : কয়েকশত বছর আগের মানববিদ্যা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বইগুলো আজও হুবহু পড়ানো হলেও, পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা ও আধুনিক গবেষণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটছে না।

বিশেষায়িত শিক্ষার অভাব : দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল চরম বৈরী পরিবেশে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক দক্ষতা তৈরির চেয়ে আকাইদ ও ইবাদতের হেফাজত প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতো বৈষয়িক ক্ষেত্রে আলেমদের ভূমিকা কিছুটা সীমিত হয়ে পড়ে।

গণমাধ্যম ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : বিশ্বজুড়ে মিডিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অথচ গণমাধ্যম ও যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমে কওমী গ্র্যাজুয়েটদের উপস্থিতি অপ্রতুল হওয়ায় তারা অনেক সময় এসব বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মো উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হচ্ছেন না।

ভাষাগত দূরত্ব : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও কওমী মাদরাসাগুলোতে দীর্ঘকাল ফারসি, উর্দু ও আরবি নির্ভর পাঠদান ব্যবস্থা চালু ছিল। যদিও বর্তমানে এ অচলায়তন ভেঙেছে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় পরীক্ষা দিচ্ছে ও চর্চা বাড়াচ্ছে, তথাপিও প্রমিত বাংলা ও আধুনিক ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি ভাষার দখল ছাড়া সার্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কঠিন।

উত্তরণের উপায় ও করণীয়

ইসলামী আকিদা ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে কওমী শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগের চাহিদার সঙ্গে উপযোগী করতে হবে। আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষার যে জোয়ার চলছে, তার সঙ্গে সমন্বয় সাধন এখন সময়ের দাবি।

STEM শিক্ষা ও আধুনিক বিষয়ের সংযোজন : বিজ্ঞান (Science), প্রযুক্তি (Technology), প্রকৌশল (Engineering) এবং গণিত (Mathematics)–সংক্ষেপে STEM সাবজেক্টগুলোর প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সমন্বিত সিলেবাস ব্যবস্থা : ইতোমধ্যে দারুল রাশাদসহ বেশ কিছু মাদরাসা সমন্বিত পাঠ্যক্রম চালু করেছে। সেখানকার শিক্ষার্থীরা কওমী বোর্ডের (যেমন: বেফাকুল মাদারিস) পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে।

ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি : প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা, রচনাশৈলী এবং আধুনিক ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার এই ইতিবাচক সমন্বয় সাধিত হলে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। এর মাধ্যমে তারা কেবল ধর্মীয় অঙ্গনেই নয়, বরং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেও প্রগতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। ■

গাজ্জার ছোট্ট ফুলেরা:
শূন্যতার ভেতর রবের রহমত

উম্মে হানি বিনতে আবদুর রহমান

আমি প্রায়ই ভাবি–গাজ্জার সেই ছোট্ট ফুলগুলো বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর কীভাবে বেঁচে থাকে? যে বয়সে একটি শিশুর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হওয়ার কথা বাবার হাত, মায়ের কোল; যে বয়সে রাতের অন্ধকারে ভয় পেলে মায়ের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা–সেই বয়সেই কত শিশু হারিয়েছে তাদের সবচেয়ে আপন মানুষগুলোকে। যে পৃথিবী তাদের কাছে

ছিল বাবা-মায়ের মুখ, ঘরের পরিচিত দেয়াল, মায়ের ডাক আর বাবার স্নেহে ভরা একটি ছোট্ট নিরাপদ আশ্রয়, যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এক মুহূর্তে সেই পৃথিবীটুকু কেড়ে নিয়েছে।

তখন মনে প্রশ্ন জাগে—ভোরের আলো ফুটলে তারা কি বাবার মুখ খোঁজে?

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশের দিকে তাকিয়ে কি তারা মাকে খুঁজে বেড়ায়?

রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কি অবুঝ হৃদয়ের কোনো এক কোণে হঠাৎ মনে পড়ে—'আজ যদি বাবা থাকত! আজ যদি মা থাকত!'

কেউ কি তাদের মাথায় হাত রেখে বলে, 'ভয় পেয়ো না, আমি আছি'?

কেউ কি তাদের কান্নার শব্দ শুনে ছুটে আসে?

কেউ কি তাদের ছোট্ট হাতটি ধরে বলে, 'চলো, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই'?

আর সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটি হলো—এত বড় শূন্যতা বুকে নিয়ে তারা আবার কীভাবে হাসে?

কীভাবে তারা গল্প করে?

কীভাবে একটি শিশুর মুখে আবার মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে?

মানুষের চোখে হয়তো এসব প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই। কিন্তু ঈমানের চোখে উত্তরটি একেবারেই ভিন্ন।

কারণ যে শিশুর পৃথিবী থেকে তার ওয়ালিদাইন সরে যান, সেই শিশুর রব তো সরে যান না।

মানুষের আশ্রয় হারিয়ে গেলেও আল্লাহর আশ্রয় কখনো হারিয়ে যায় না।

মানুষের হাত ছেড়ে গেলেও রবের রহমতের হাত তাকে ছেড়ে যায় না।

যে শূন্যতা কোনো মানুষ পূরণ করতে পারে না, সেই শূন্যতার গভীরতম জায়গাতেও আল্লাহ এমন এক প্রশান্তি ঢেলে দিতে পারেন, যার রহস্য মানুষের বোধের অতীত।

তিনি তো রব্বুল আলামিন—সমস্ত জগতের প্রতিপালক।

তিনি জানেন একটি শিশুর কান্না কখন শব্দহীন হয়ে যায়। তিনি জানেন কোন রাতে একটি শিশু ঘুমের মধ্যে বাবাকে ডাকে। তিনি জানেন কোন মুহূর্তে মায়ের স্মৃতি তার বুকের ভেতর হাহাকার তোলে। পৃথিবীর কোনো ক্যামেরা, কোনো সংবাদ, কোনো পরিসংখ্যান হয়তো সেই অদৃশ্য কান্নাকে ধারণ করতে পারে না; কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান থেকে কিছুই আড়াল নয়।

কারণ এই শিশুরা মাজলুম।

আর মজলুমের জন্য তার রব যথেষ্ট।

কখনো কখনো রব্বুল ইজ্জত তাঁর অসীম হিকমতে ছোট্ট হৃদয়গুলোর মধ্যে এমন এক বুঝ দান করেন, যা তাদের বয়সের তুলনায় বিস্ময়কর। এমন কিছু উপলব্ধি তাদের হৃদয়ে ঢেলে দেন, যা কোনো দীর্ঘ বক্তৃতা, কোনো বই কিংবা কোনো দার্শনিক শিক্ষা তাদের দিতে পারে না।

ভাবি, সেই দৃশ্যটির কথা।

একটি ছোট্ট শিশু। বয়স হয়তো এতটুকুই যে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা বোঝার কথা নয়। অথচ তার পৃথিবী থেকে বাবা হারিয়ে গেছে। হয়তো সে পুরোপুরি বোঝেও না 'চিরতরে হারিয়ে যাওয়া' কথাটির অর্থ। তবু একদিন মায়ের দিকে তাকিয়ে, একেবারে স্বাভাবিক শিশুসুলভ কণ্ঠে সে বলে ওঠে—

'আমার তো বাবা নাই। আল্লাহ আমাকে এই কষ্টের বিনিময়ে

জান্নাত দিবেন, তাই না আম্মু?'

সুবহানাল্লাহিল আযীম!

এতটুকুন মুখ।

এত বড় শোক।

আর সেই শোকের মাঝেও কী অপূর্ব এক সুকূন!

একটি শিশুর বুকের ভেতর থেকে বাবা হারানোর হাহাকারকে আল্লাহ কী সহজেই জান্নাতের আশায় শান্ত করে দিতে পারেন!

যে চোখে আপনজন হারানোর অশ্রু, সেই চোখেই তিনি আখিরাতের স্বপ্ন এঁকে দেন।

যে হৃদয়ে গভীর শূন্যতা, সেখানেই তিনি রহমতের আলো জ্বেলে দেন।

দুনিয়া তাকে বলছে–'তুমি হারিয়েছ।'

ঈমান তাকে বলছে–'আল্লাহর কাছে কিছুই হারায়নি।'

এই পার্থক্যটিই হয়তো মজলুমের শক্তি।

গাজ্জার শিশুরা শুধু যুদ্ধের শিকার নয়; তারা আমাদের বিবেকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক কঠিন প্রশ্ন।

একটি শিশুর কী অপরাধ?

তার বাবার কী অপরাধ?

তার মায়ের কী অপরাধ?

তার ঘরটি কেন ধ্বংস হবে?

তার খেলনা কেন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়বে?

তার স্কুল কেন নিরাপদ থাকবে না?

তার হাসপাতাল কেন আশ্রয়স্থল না হয়ে আতঙ্কের স্থানে পরিণত হবে?

একটি শিশুর শৈশব কেড়ে নেওয়ার অধিকার পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।

কিন্তু মানুষ যখন ক্ষমতার অহঙ্কারে, প্রতিহিংসার অন্ধতায় কিংবা নিষ্ঠুরতার উন্মাদনায় নিজের মানবিকতাকেই বিসর্জন দেয়, তখন সে শুধু একটি ঘর ধ্বংস করে না–একটি শিশুর নিরাপত্তাবোধ, বিশ্বাস, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎও ধ্বংস করে।

মাজলুম হয়তো দুনিয়ায় অনেক কিছু হারায়।

বাবা হারায়।

মা হারায়।

ভাই-বোন হারায়।

ঘর হারায়।

স্বজন হারায়।

শৈশব হারায়।

কখনো কখনো নিজের শরীরের কোনো অঙ্গও হারায়।

কিন্তু আল্লাহর কাছে সে কিছুই হারায় না।

তার প্রতিটি অশ্রু সংরক্ষিত।

তার প্রতিটি আহাজারি জানা।

তার প্রতিটি নিঃশব্দ কষ্ট তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

এ কারণেই মজলুমের গল্প কখনো শেষ হয়ে যায় না।

দুনিয়ার আদালত ব্যর্থ হতে পারে। মানুষের বিচার বিলম্বিত হতে পারে। ক্ষমতাবানরা নিজেদের অপরাধকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চাইতে পারে। কিন্তু এমন এক আদালত আছে, যেখানে কোনো সাক্ষীকে ভয় দেখানো যায় না, কোনো প্রমাণ গোপন করা যায় না, কোনো ক্ষমতার প্রভাব চলে না।

সেই আদালত আল্লাহর।

আর জালিম?

জালিমের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো–সে হয়তো দুনিয়ার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু রবকে নয়।

সে হয়তো নিজের অন্যায়কে যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারে।

সে হয়তো ইতিহাসকে নিজের মতো করে লিখতে পারে।

সে হয়তো শক্তির অহঙ্কারে ভাবতে পারে–কেউ তাকে থামাতে পারবে না।

কিন্তু সে ভুলে যায়–ক্ষমতা মানুষের হাতে সাময়িক; বিচার আল্লাহর হাতে চিরস্থায়ী।

যে দুর্বলদের ওপর জুলুম করেছে, যে অসহায়দের কান্নাকে তুচ্ছ করেছে, যে শিশুর নিরাপত্তাকে ধ্বংস করেছে, যে মানুষের ঘর কেড়ে নিয়েছে–তার প্রতিটি কর্মের হিসাব আছে।

কারণ রব আছেন।

আর রবের কাছে কোনো জুলুম হারিয়ে যায় না।

মাজলুমের কান্না হয়তো পৃথিবীর কোলাহলে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু আসমানের নীরবতায় তা হারিয়ে যায় না।

তাই গাজ্জার সেই ছোট্ট ফুলগুলোর দিকে তাকালে শুধু করুণা নয়—আমাদের ঈমানও জেগে ওঠা উচিত।

তাদের ভাঙা ঘর আমাদের মানবিকতার আয়না।

তাদের অশ্রু আমাদের বিবেকের পরীক্ষা।

তাদের মুচকি হাসি আমাদের জন্য ঈমানের শিক্ষা।

তারা যেন বলে—মানুষ আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু আমার রবকে কেড়ে নিতে পারে না।

আমার বাবা নেই—কিন্তু আল্লাহ আছেন।

আমার মা নেই—কিন্তু আল্লাহ আছেন।

আমার ঘর নেই—কিন্তু আল্লাহর জমিন আছে।

আমার শৈশব ক্ষতবিক্ষত—কিন্তু আমার রবের কাছে আমার প্রতিটি অশ্রুর মূল্য আছে।

হয়তো এ কারণেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও কোনো কোনো শিশুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

হয়তো সেই হাসির পেছনে থাকে এমন এক বিশ্বাস, যা বড়দের অনেক সময়ও অর্জন করা কঠিন।

হয়তো সে জানে না পৃথিবীর রাজনীতি কী, যুদ্ধের কৌশল কী, আন্তর্জাতিক শক্তির হিসাব কী। সে শুধু জানে—আল্লাহ তাকে দেখছেন।

আর যে হৃদয় এই বিশ্বাসে বেঁচে থাকে, তাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা যায় না।

সুবহানাল্লাহিল আযীম!

ছোট্ট একটি হৃদয়—যাকে আল্লাহ জান্নাতের আশায় সান্ত্বনা দিয়েছেন।

একটি মুচকি হাসি—যার ভেতরে লুকিয়ে আছে অশ্রুসিক্ত এক ইতিহাস।

একটি শিশুর মুখ—যেখানে একই সঙ্গে শোক ও আশার বসতি।

রবের রহমত কখনো কখনো এমনভাবেই আসে—অন্ধকারের ভেতর একটি ক্ষীণ আলো হয়ে, কান্নার ভেতর একটি প্রশান্তি হয়ে, শূন্যতার ভেতর জান্নাতের স্বপ্ন হয়ে।

আল্লাহ গাজ্জার এই ছোট্ট ফুলগুলোর অন্তরকে তাঁর রহমতে পূর্ণ করে দিন।

তাদের হারানো স্বজনদের উত্তম প্রতিদান দিন।

তাদের প্রতিটি অশ্রুকে সওয়াবে পরিণত করুন।

তাদের প্রতিটি ভয়কে নিরাপত্তায় বদলে দিন।

তাদের প্রতিটি ক্ষতকে রহমতের দরজা বানিয়ে দিন।

আর যারা জুলুম করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করুন।

কারণ আমরা বিশ্বাস করি—

মাজলুম একা নয়।

তার সঙ্গে তার রব আছেন।

আর যে রবের কাছে একজন অসহায় শিশুর কান্নাও অমূল্য—তাঁর বিচারে কোনো জুলুমই শেষ পর্যন্ত অগণিত থাকে না।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন।

মাযলুমের প্রতিটি কান্না পৃথিবীর মানুষ না শুনলেও—তার রব অবশ্যই শোনেন। ■

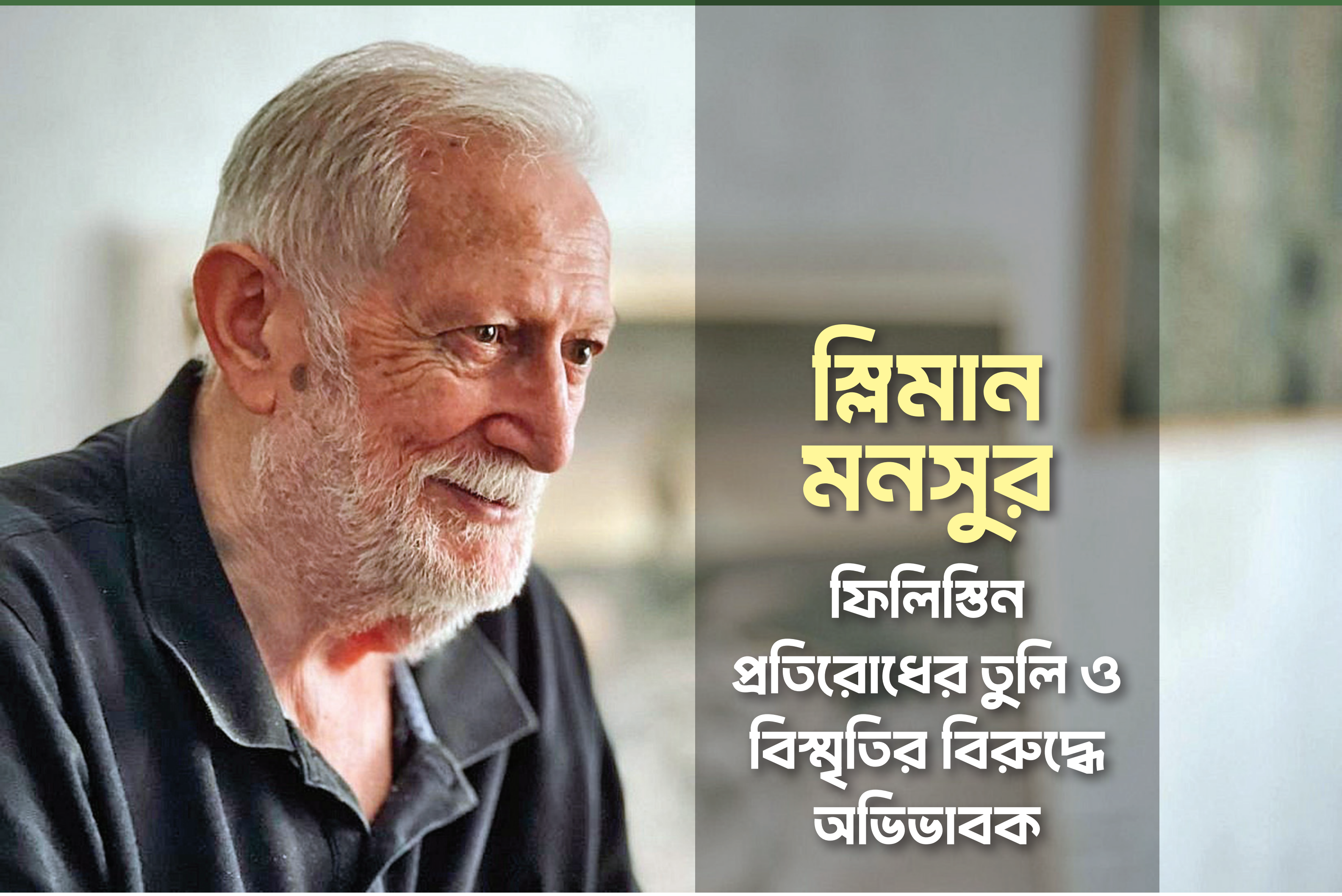

স্লিমান মনসুর
ফিলিস্তিন প্রতিরোধের তুলি ও বিস্মৃতির বিরুদ্ধে অভিভাবক

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়জুড়ে বিস্তৃত বর্ণাঢ্য শৈল্পিক জীবনের ইতি টেনে ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ফিলিস্তিনি দৃশ্যশিল্পের অন্যতম পুরোধা স্লিমান মনসুর। জীবনভর তিনি তাঁর শিল্প ও তুলিকে উৎসর্গ করেছিলেন ফিলিস্তিনের চেতনা ফুটিয়ে তুলতে এবং দেশটির মাটি, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নথিবদ্ধ করার সংগ্রামে।

মনসুর ছিলেন ফিলিস্তিনের আধুনিক দৃশ্যশিল্প আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। শিল্পকলার মাধ্যমে জাতীয় স্মৃতি রক্ষা করা এবং ইতিহাস বিকৃতি বা মুছে ফেলার যেকোনো অপচেষ্টাকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন। তাঁর সৃষ্ট দৃশ্যকল্পগুলো ফিলিস্তিনি পরিচয় ও প্রতিরোধের চিরন্তন প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মে–'নাকবা' (The Nakba)-র প্রায় এক বছর আগে–বীরজাইতে জন্ম নেন মনসুর। মাত্র চার বছর বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। মা একাই তাঁকে ও তাঁর ভাইবোনদের লালন-পালন করেন। শৈশব ও কৈশোরের একটি বড় সময় কেটেছে বীরজাইত, বেথলেহেম ও বেইত জালার রূপময় গ্রামীণ পরিবেশে। সেখানে ফিলিস্তিনের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাটির তামাটে রঙ, জলপাই গাছ, লেবুর ফুল, কৃষকের মেহনতি হাত এবং শান্ত গ্রামীণ দৃশ্যপট পরবর্তীতে তাঁর ক্যানভাসের মূল উপাদানে পরিণত হয়।

১৯৭৩ সালে, ২৬ বছর বয়সে মনসুর তাঁর সবচেয়ে যুগান্তকারী চিত্রকর্ম 'দ্য ক্যামেল অব হার্ডশিপস'
(The Camel of Hardships) অঙ্কন করেন

ছোটবেলা থেকেই তাঁর শৈল্পিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে জাতিসংঘ আয়োজিত একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিল্পকলা পড়ার ইচ্ছা থাকলেও ১৯৬৭ সালের জুনের যুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর তিনি জেরুজালেমের বিখ্যাত 'বেজালেল একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন'-এ ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনের একপর্যায়ে তিনি রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

শৈল্পিক রূপকল্প পরিপক্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনসুর উপলব্ধি করেন, ফিলিস্তিনকে শুধু জলপাই গাছ, লেবুর ফুল কিংবা ঐতিহ্যবাহী পোশাকের অপরূপ কোনো গ্রাম হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কারণ এই ভূমির ইতিহাস রক্তপাত, উচ্ছেদ ও দখলের বেদনায় ভারাক্রান্ত। ফলে তাঁর চিত্রকর্ম কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা হয়ে ওঠে আধুনিক ফিলিস্তিনের জীবনসংগ্রাম, আত্মমর্যাদা ও শিকড়ের প্রতি অবিচল ভালোবাসার দলিল।

তবে বাস্তবতার এই চরম অন্ধকারের মধ্যেও মনসুর তাঁর ক্যানভাসকে কখনো হতাশার অনুষঙ্গ হতে দেননি। ট্র্যাজেডির মাঝেও তিনি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৌন্দর্য ও আশার আলো ফুটিয়ে তুলেছেন। এভাবেই তিনি ফিলিস্তিনি শিল্পে 'প্রতীকী বাস্তববাদ'-এর (Symbolic Realism) অন্যতম অগ্রপথিক হয়ে ওঠেন।

'দ্য ক্যামেল অব হার্ডশিপস': পিঠে বয়ে চলা ফিলিস্তিন

১৯৭৩ সালে, ২৬ বছর বয়সে মনসুর তাঁর সবচেয়ে যুগান্তকারী চিত্রকর্ম 'দ্য ক্যামেল অব হার্ডশিপস' (The Camel of Hardships) অঙ্কন করেন। মানব চোখের আকৃতিতে নির্মিত এই চিত্রে দেখা যায়, ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধ ফিলিস্তিনি তাঁর পিঠে সমগ্র জেরুজালেম শহর বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি ফিলিস্তিনিদের কাঁধে নিজ মাতৃভূমির ঐতিহাসিক ও সামাজিক বোঝার প্রতীক হিসেবে যৌথ স্মৃতির গভীরে গেঁথে যায়।

চিত্রকর্মটি দ্রুতই শিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে এক জাতীয় প্রতীকে রূপ নেয়। বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনিদের ঘরে ঘরে এর প্রতিলিপি পৌঁছে যায় এবং মনসুরকে ফিলিস্তিনি শিল্পের প্রধানতম দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর মাধ্যমে তিনি এক চিরন্তন সত্য ফুটিয়ে তোলেন—বহু দশক ধরে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের মাতৃভূমির দুঃখ-কষ্টের ভার পিঠে বহন করছেন এবং তা বিশ্বমঞ্চে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরছেন।

চিত্রকর্মটির ইতিহাসও বেশ ঘটনাবহুল। ১৯৭৩ সালের মূল সংস্করণটি দীর্ঘদিন নিখোঁজ ছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টিস (Christie's) জানায়,

লন্ডনের এক সংগ্রাহকের কাছে মূল চিত্রকর্মটি সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯৭৬ সালে মনসুর দ্বিতীয় একটি সংস্করণ আঁকেন, যা লন্ডনে লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত কিনে নিয়ে মুয়াম্মর গাদ্দাফিকে উপহার দেন। ধারণা করা হয়, ১৯৮৬ সালে ত্রিপোলিতে মার্কিন বিমান হামলায় সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। ২০০৫ সালে তিনি তৃতীয় একটি সংস্করণ তৈরি করেন, যা বর্তমানে বৈরুতের রামজি দালুল কালেকশনে সংরক্ষিত।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'ব্রাইড অব দ্য হোমল্যান্ড', 'ডটার অব জেরুজালেম', 'সাবরা অ্যান্ড শাতিলা', 'রিচুয়ালস আন্ডার অকুপেশন' এবং 'মেমোরি অব প্লেসেস'। এসব চিত্রে কিছু অনুষঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে–কৃষক, ঐতিহ্যবাহী সূচিকর্মের পোশাক পরা নারী, জলপাই ও কমলা গাছ, গ্রামীণ জনপদ, চাবি, কারাগার, চেকপয়েন্ট, কুফিয়া, গম্বুজ (ডোম অব দ্য রক), গমের শীষ ও পায়রা।

মনসুর দূর থেকে ফিলিস্তিনের ছবি আঁকেননি; তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন খোদ সেই মাটি থেকেই। তাঁর কাছে ফিলিস্তিনের প্রকৃতি স্রেফ কোনো পটভূমি ছিল না, বরং তা ছিল পরিচয় ও স্মৃতির সুগভীর উৎস।

দখলদারিত্ব ও বিস্মৃতির বিরুদ্ধে শিল্প

১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হলে মনসুরের ক্যানভাসে যুক্ত হয় নতুন রাজনৈতিক মাত্রা। ইসরাইলি পণ্য বর্জন ও আত্মনির্ভরশীলতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ক্যানভাসে স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার শুরু করেন। তিনি কাদা, খড়, কাঠ, চক, চুন, প্রাণিজ চর্বি ও প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করতেন। এমনকি কাদার সঙ্গে সুমাক, জিরা, কফি ও মেহেদির মতো গৃহস্থালি উপাদান মেশাতেন।

ইন্তিফাদার সময় তিনি 'নিউ ভিশন' (New Vision) গ্রুপ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োগকে এই শৈল্পিক গোষ্ঠী একাধারে নান্দনিক ও রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া তিনি 'ফিলিস্তিনি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন', 'গ্যালারি ৭৯', জেরুজালেমের 'আল-ওয়াসিতি আর্ট সেন্টার' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব আর্ট ফিলিস্তিন' প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন।

চিত্রকর্মের পাশাপাশি তিনি শিল্পকলায় শিক্ষাদান করেছেন। 'আল-ফজর' সংবাদপত্র ও 'আল-আওদা' ম্যাগাজিনে কার্টুনিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রামাল্লাহ, নিউইয়র্ক, শারজাহ, নরওয়ে ও কায়রোসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও সূচিকর্মভিত্তিক বই তৈরিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

মনসুর শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন, এই লড়াই কেবল ভূখণ্ডের নয়; এটি চিত্র ও স্মৃতির অস্তিত্ব রক্ষারও লড়াই। তাঁর শিল্পের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনিদের ইতিহাস ও মানবতাকে বিকৃত করার যেকোনো প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

এর একটি অনুপম দৃষ্টান্ত তাঁর শিল্পকর্মে 'পবিত্র পরিবার' বা হোলি ফ্যামিলির (Holy Family) উপস্থাপনা। তিনি যীশুকে ফিলিস্তিনি কুফিয়া পরিহিত অবস্থায় চিত্রায়িত করেন। এর মাধ্যমে তিনি যীশু ও তাঁর পরিবারের ফিলিস্তিনি ঐতিহাসিক মূলকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ অনুভব করেছেন।

তাঁর চিত্রে ফিলিস্তিনি নারীরা হয়ে উঠেছেন উর্বরতা, মাতৃভূমি ও শক্তির প্রতিকৃতি। প্রথাগত পোশাকে সজ্জিত নারীরা যেমন ফিলিস্তিনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি মাটির সঙ্গে মানুষের গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ট্র্যাজেডির মাঝেও এক সুন্দর ফিলিস্তিন

নাকবা থেকে শুরু করে দখলদারিত্ব, ইন্তিফাদা এবং গাজার সাম্প্রতিক সংঘাত-ফিলিস্তিনের প্রতিটি করুণ অধ্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তবুও ফিলিস্তিনের এক সুন্দর ও প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি ক্যানভাসে ধরে রাখার প্রয়াস তিনি কখনো থামাননি।

১৯৮০ সালে তিনি আঁকেন 'ফিলিস্তিনিয়ান ব্রেকফাস্ট'। তাবুন রুটি, টমেটো, পেঁয়াজ ও জলপাই সাজানো সেই সাধারণ টেবিলকে তিনি নিজস্ব উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা ও সহনশীলতার রূপক হিসেবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৯০ সালে আঁকেন 'অলিভ হারভেস্ট'।

মনসুরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট-ফিলিস্তিনের সৌন্দর্য তুলে ধরা কোনো রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়; বরং এটিই প্রতিরোধের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার (Resistance)। ঘরবাড়ি, জলপাই গাছ, পোশাক ও খাবারের দৈনন্দিন উপাদান যখন শিল্পে রূপ নেয়, তখন তা পরিণত হয় স্মৃতির এক দুর্ভেদ্য দুর্গে।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে গাজার ক্রমবর্ধমান মানবিক ট্র্যাজেডি তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তবু তিনি তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন-সৌন্দর্যকে বিসর্জন না দিয়েই তিনি ফিলিস্তিনের ছবি এঁকে গেছেন।

ফিলিস্তিনি শিল্পচর্চার কারিগর

মনসুরের অবদান কেবল ক্যানভাসে সীমাবদ্ধ ছিল না। ফিলিস্তিনি আধুনিক দৃশ্যশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পী গঠনে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। ২০২৪ সালে তিনি 'ফিলিস্তিন মিউজিয়াম'-এর জন্য কাদামাটি, খড় ও মেহেদির সংমিশ্রণে 'অন দ্য উইং অব অ্যান এঞ্জেল' নামের একটি স্থায়ী ম্যুরাল তৈরি করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি 'ফিলিস্তিন প্রাইজ ফর প্লাস্টিক আর্টস', 'ইউনেস্কো-শারজাহ প্রাইজ ফর আরব কালচার' এবং 'নাইল অ্যাওয়ার্ড ফর আরব ক্রিয়েটর্স'-সহ দেশি-বিদেশি অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

যে চিত্রকর্মটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল

জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তুলি হাতছাড়া করেননি। মৃত্যুর এক বছর আগে, ৭৯তম জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেছিলেন–প্রতিবার মোমবাতি নেভানোর সময় তাঁর মনে হয় বয়স বুঝি এক বছর কমে যাচ্ছে! হয়তো বয়সের ভার বা অসুস্থতাকে হালকা করারই এক রূপক চেষ্টা ছিল সেটি।

মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ মাধ্যম 'শারক আল-আওসাত' (Asharq Al-Awsat)-কে দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এমন কোনো স্বপ্নের ছবি আছে কি না, যা তিনি এখনো এঁকে উঠতে পারেননি। প্রত্যুৎপন্নমতিতার সঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন–তিনি 'প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া' একটি স্বাধীন ও সুন্দর ফিলিস্তিনের ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখেন।

এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, কোনো রাজনৈতিক বিকৃতি বা কৃত্রিম বয়ান ছাড়া ফিলিস্তিনকে তার আসল, ঐতিহাসিক ও মানবিক সৌন্দর্যে দেখতে চান।

মনসুর হয়তো সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ফিলিস্তিনের ছবি ক্যানভাসে এঁকে যাওয়ার আগেই বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি অন্যভাবে ঠিক সেই ছবিটিই এঁকে গেছেন। ফিলিস্তিনকে তিনি মাটির রূপ দিয়েছেন; জেরুজালেম, জলপাই গাছ, নারী, চাবি ও অদম্য সংগ্রামের রূপ দিয়েছেন। 'দ্য ক্যামেল অব হার্ডশিপস' থেকে শুরু করে তাঁর শেষ সৃষ্টি পর্যন্ত– স্লিমান মনসুরের তুলি কেবল রঙ ছড়ায়নি, বরং একটি গোটা মাতৃভূমির আত্মাকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বহন করে নিয়ে গেছে।

শিল্পী বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আঁকা ফিলিস্তিন রয়ে গেছে চিরভাস্বর–এক অপরাজেয় সৌন্দর্য, স্মৃতি ও রূপক প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে।

রবিউল আউয়াল : স্মৃতি, রহমত ও আত্মশুদ্ধির মাস

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম, হিজরত ও ওফাত–সবই রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হওয়ায় এই মাসটি লাভ করেছে এক অনন্য ঐতিহাসিক পূর্ণতা।

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

(ইসলামি বর্ষপঞ্জির খুব কম মাসই রবিউল আউয়ালের মতো এত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতির ভার বহন করে। ঐতিহ্যগতভাবে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত, যদিও সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এছাড়াও এই মাসটি ইসলামি ইতিহাসের আরও কিছু যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী, যার মধ্যে রয়েছে মদিনায় মহানবীর হিজরত সম্পন্ন হওয়া এবং তাঁর ওফাত। এসব ঘটনা মিলিয়ে রবিউল আউয়াল মাসটি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ, আত্মোপলব্ধি এবং তাঁর আদর্শের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।)

ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জির তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল মুসলিম ইতিহাস ও অনুভূতির এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। 'রবিউল আউয়াল' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রথম বসন্ত'—যদিও হিজরি পঞ্জিকা চন্দ্রবছরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই মাসটি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বছরজুড়ে আবর্তিত হয়। এই মাসের গুরুত্ব কোনো নির্ধারিত রোজা বা হজের মতো বিধান থেকে আসে না; বরং এটি অর্জন করেছে এর সাথে যুক্ত অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে—যে ঘটনাগুলো ঐশী বার্তার আগমন, সমাজ গঠন এবং সেই বার্তা বহনকারীর বিদায়কে একই সুতোয় গেঁথেছে।

আমুল ফিল বা হস্তী বর্ষে (সাধারণত ৫৭০-৫৭১ খ্রিস্টাব্দ) মক্কায় মহানবী (সা.)-এর জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়েই এই মাসটি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ একমত যে তিনি একটি সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে প্রাথমিক ঐতিহাসিক বর্ণনায় কিছু মতভেদ দেখা যায়। ১২ রবিউল আউয়াল ঐতিহ্যগতভাবে সর্বাধিক স্বীকৃত তারিখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, যদিও অন্যান্য সূত্রে ভিন্ন দিনের কথাও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক এই বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েই মূল ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্যকে হৃদয়ে ধারণ করা সম্ভব।

মহানবীর (সা.) জন্মই রবিউল আউয়ালকে দিয়েছে এক চিরন্তন আবেগময় অনুভূতি। মুসলমানরা তাঁর নবুওয়াত ও আগমনকে এক ঐশী রহমত হিসেবে দেখে, যা একত্ববাদের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং সত্যতা, ন্যায়বিচার, সমবেদনা ও দায়িত্ববোধের ওপর ভিত্তি করে এক বিস্তৃত নৈতিক দর্শনের সূচনা করেছে। কুরআন তাঁকে 'বিশ্বজগতের জন্য রহমত' (২১:১০৭) হিসেবে বর্ণনা করেছে—যা প্রতিফলিত হয়েছে গরিব ও এতিমদের প্রতি তাঁর যত্ন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় লেনদেনে তাঁর ইনসাফ, নির্যাতনের মুখে তাঁর অসীম ধৈর্য এবং ক্ষমতাহীন অবস্থা থেকে ক্ষমতায় আসীন হয়েও তাঁর সাধারণ ক্ষমার মধ্যে।

রবিউল আউয়াল ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনেরও স্মারক। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। বছরের পর বছর শত্রুতামূলক আচরণ ও নির্যাতনের পর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এক নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে

মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক যাত্রা এই মাসেই প্রথমে কুবা এবং পরবর্তীতে মদিনায় গিয়ে শেষ হয়। যদিও হিজরি সন মহররম মাস থেকে শুরু হয়, কিন্তু এই হিজরতের ঘটনাটিই পরবর্তীতে ইসলামি সন গণনার মূল ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়।

হিজরতের স্মৃতি এই মাসটিকে কেবল অতীত স্মরণের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক নতুন অর্থ দান করে। হিজরত এক অত্যাচারিত গোষ্ঠীকে এক সুসংগঠিত সমাজে পরিণত করেছিল। কুবায় ইবাদত ও ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, মক্কার মুহাজির এবং মদিনার আনসারদের বন্ধন সুদৃঢ় করেন এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যেখানে ধর্মের সাথে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মেলবন্ধন ঘটেছিল। সুতরাং, রবিউল আউয়াল কেবল দুটি শহরের মধ্যবর্তী যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয় না; এটি দুর্বলতা থেকে দায়িত্বশীলতায় এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে যৌথ মূল্যবোধের বাস্তব অনুশীলনের দিকে উত্তরণের এক মহিমান্বিত প্রতীক।

তবে এই মাসটির সাথে জড়িয়ে আছে গভীর শোকের সুরও। একাদশ হিজরির (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবারে মহানবী (সা.) মদিনায় ইন্তেকাল করেন। সনাতন বর্ণনাগুলোতে ১২ রবিউল আউয়ালকেই ওফাতের তারিখ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আলেমগণ অন্যান্য তারিখ নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর ওফাত সাহাবিদের গভীরভাবে শোকাহত করেছিল, কিন্তু একই সাথে এটি নতুন গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজকে এক অপরিহার্য পরিপক্বতার শিক্ষা দিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.) ছিলেন মরণশীল, আর আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। রাসূল (সা.) বিদায় নিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু কুরআন, তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ এবং উম্মাহর দায়িত্ব অক্ষুণ্ন ছিল।

জন্ম, হিজরত এবং ওফাত– এই তিনটি প্রধান স্মৃতি রবিউল আউয়ালকে দিয়েছে এক ঐতিহাসিক পূর্ণতা। তাঁর জন্ম হলো হেদায়াত বা ঐশী পথনির্দেশের আগমন; হিজরত হলো সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলা; আর মহানবীর ওফাত হলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই আমানত ও দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রতীক। সব মিলিয়ে এই তিনটি বিষয় মাসটিকে স্মৃতিচারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার সময়ে পরিণত করেছে।

বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে রবিউল আউয়াল পালন করে থাকেন। অনেক সমাজ ও গোষ্ঠী কুরআন তিলাওয়াত, সীরাত মাহফিল, দরূদ ও নাত পাঠ, দাতব্য কর্মকাণ্ড এবং মহানবীর ওপর দরূদ পাঠের মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। অনেকে আবার নীরব অধ্যয়ন, ইবাদত ও চিন্তার মাধ্যমে এই সময়টিকে অতিবাহিত করেন। সমাজভেদে উদযাপনের বাহ্যিক রূপ ভিন্ন হতে পারে, তবে মহানবীর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই

> রবিউল আউয়াল কেবল বর্ষপঞ্জির সাধারণ কোনো স্মারক তারিখ নয়। এটি এমন এক মাস যা মহানবীর নবুওয়াতের মূল তিনটি অধ্যায়কে একই সূত্রে নিয়ে আসে: বার্তাবাহকের আগমন, একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর আমানতের ধারাবাহিকতা রক্ষা। এই মাসের সর্বোত্তম ইবাদত হলো তিনি যেসব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেগুলোকে নিজের জীবনে পুনরুজ্জীবিত করা এবং প্রজ্ঞা, সমবেদনা ও সততার সাথে তা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হলো প্রধান মূলভিত্তি। এই মাসের স্মৃতিচারণকে বিভেদের উৎস না বানিয়ে, এই বৈচিত্র্যগুলোকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

রবিউল আউয়াল হলো মহানবীর সীরাত বা জীবনীকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত করার এক বিশেষ সুযোগ। মহানবী (সা.) সম্পর্কে জানা কেবল কিছু ঐতিহাসিক তারিখ মুখস্থ রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাঁর জীবন ও চরিত্র পারিবারিক সম্পর্ক, প্রতিবেশীর অধিকার, সৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, নেতৃত্ব, সামাজিক আপস-রফা এবং দুর্বলদের সুরক্ষার বিষয়ে ব্যবহারিক নির্দেশনা দেয়। মহানবীর ওপর প্রশংসার পাশাপাশি যখন সত্যবাদিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, নম্রতা ও মানবসেবার চর্চা বজায় থাকে–তখনই এই মাসের প্রকৃত সার্থকতা প্রকাশ পায়।

সংঘাত, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের দুর্ভোগের প্রতি উদাসীনতার এই যুগে মহানবীর এই শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন রূপরেখা দেখায় যে, শক্তির সাথে দয়া, মতভেদের সাথে আত্মমর্যাদা এবং নেতৃত্বের সাথে বিনয় কীভাবে একই সাথে অবস্থান করতে পারে। তাঁকে

রবিউল আউয়াল মাসের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

রবিউল আউয়ালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো মুসলমানদের বিশ্বাস, জীবনচর্চা ও পরিচয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাথমিক ঐতিহাসিক বর্ণনায় কিছু ঘটনার সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাই যেখানে নির্দিষ্ট দিন সর্বসম্মত নয়, সেখানে শুধু মাস বা হিজরি সাল উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনা	ঐতিহাসিক তাৎপর্য
মহানবীর জন্ম	হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমুল ফিল বা হস্তী বর্ষে (সাধারণত ৫৭০-৫৭১ খ্রি.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সোমবার দিনে তাঁর জন্ম সর্বজনস্বীকৃত; তবে রবিউল আউয়ালের সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, যার মধ্যে ১২ রবিউল আউয়াল সর্বাধিক পরিচিত।
মহাত্যাগের হিজরত	১ম হিজরি/৬২২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁরা প্রথমে কুবায় পৌঁছান এবং পরে মদিনায় প্রবেশ করেন, যা ইসলামি ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এটি হিজরি বর্ষের গণনা প্রক্রিয়ার সূচনা নিশ্চিত করে (যদিও ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম হিসেবেই বহাল থাকে)।
মসজিদে কুবায়ের নির্মাণ	মহানবী (সা.) ইসলামি ইতিহাসের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। (১২ রবিউল আউয়াল)
কন্যা বিবাহ	মহানবী (সা.)-এর সুকন্যা সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (রা.)-এর সাথে সাইয়েদুনা উসমান (রা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। (৩ হিজরি)
অভিযানসমূহ	গাতফান অভিযান (৩ হিজরি); বনু নাদির অভিযান (৪ হিজরি); দুমাতুল জান্দাল অভিযান (৫ হিজরি)।
পুত্রের ওফাত	মহানবী (সা.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইব্রাহিম (রা.) ইন্তেকাল করেন। (১০ রবিউল আউয়াল, ১০ হিজরি)
মহানবীর ওফাত	১১ হিজরি/৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবারে মদিনায় মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। ১২ রবিউল আউয়াল সর্বাধিক পরিচিত তারিখ হলেও, গবেষকগণ অন্যান্য তারিখ নিয়েও আলোচনা করেছেন।
মহানবীর ওফাত (নির্দিষ্ট দিন)	সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল/১২ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহর প্রিয় রাসূল ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন

স্মরণ করার অর্থ হওয়া উচিত সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো, অভাবীদের সাহায্য করা, অবিচারের প্রতিবাদ করা এবং সমাজ গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখা।

অতএব, রবিউল আউয়াল কেবল বর্ষপঞ্জির সাধারণ কোনো স্মারক তারিখ নয়। এটি এমন এক মাস যা মহানবীর নবুওয়াতের মূল তিনটি অধ্যায়কে একই সূত্রে নিয়ে আসে: বার্তাবাহকের আগমন, একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর আমানতের ধারাবাহিকতা রক্ষা। এই মাসের সর্বোত্তম ইবাদত হলো তিনি যেসব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেগুলোকে নিজের জীবনে পুনরুজ্জীবিত করা এবং প্রজ্ঞা, সমবেদনা ও সততার সাথে তা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ■